কক্ষপথের
বাইরে
অন্তু বিশ্বাস

প্রকাশকঃ লেখক

যোগাযোগঃ8670394206(whatsapp)

মূল্যঃ পিডিএফ(pdf) ডাউনলোডে যেটুকু ড্যাটা(Data)

প্রচ্ছদ নির্মাণেঃ অরিক

"....সন্ধ্যার দিকে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে।ক'দিন খুব গরম পড়ছিল।এখন চারিদিকটা ঠান্ডা।কোথা থেকে যেন আরো শিতল বাতাস শোভনের জানলা দিয়ে ঢুকছে।বেশিক্ষণ তাই জেগে থাকা হল না ওর।মূহুর্তেই ঘুমের রাজ্যে ডুব দেয় সে।কোথায় যেন হারিয়ে যায়।..."
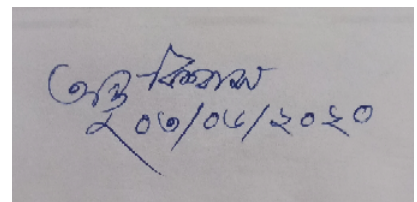
উৎসর্গঃ

আমার বাবা শংকর কুমার বিশ্বাসকে(তিনি নেই)
যিনি আমাকে ছুঁয়ে থাকেন সবসময়।

যারা পাশে থেকেছেন

এটি উপন্যাস কিনা জানি না।তবে আকারে যেহেতু বড় আর একটু কাহিনীও নির্মিত হয়েছে,সেই জন্য নিজেস্ব স্বাধীনতায় নাম দিয়েছি উপন্যাস।তবুও পাঠকের উপরই রয়ে গেলো তার ভার।তবে উপন্যাস উপন্যাস করে অনেক চিৎকার করায় কিছু মানুষের সংস্পর্শে এসেছি।প্রথমেই বলব, নিশীথ সরকার(ইঞ্জিনিয়ার) দাদার কথা।মাঝে মাঝে টুকরো টুকরো লেখা যখনই ওনার সামনে এসেছে, ওনি মতামত জানিয়ে আমাকে সমৃদ্ধ করেছে।আমাকে যদি লেখক হিসেব একটু যদি কেউ গুরুত্ব দিয়ে থাকে,তাহলে নিশীথ দাদাকে আমি আগেই রাখবো।অর্পি(দাদার মেয়ে)কে কখনো একটু গল্প শুনিয়েছি।চরিত্রগুলো কোথায় কি করছে তা জানতে চেয়েছে বারবার। কথা (ভাগ্নি) মাঝে মাঝেই জিজ্ঞেস করেছে,"মামা,উপন্যাস লেখা শেষ হবে কখন?" ওর এই আগ্রহ আমাকে লিখতে আরো নিবেদিত করেছে।অঙ্কুর আর সৌম্যের সাথে মাঝে মাঝে আলোচনা করেছি।উপন্যাসের আকারের উপর সৌম্যের পরামর্শ আমাকে সমৃদ্ধ করেছে।আর একজনের কথা বলে, এই পর্ব শেষ করবো- যাকে আমি একটা নাম দিয়েছি।সেই আমার বিষন্নতাকে।যার সাথে চরিত্রগুলো নিয়ে, কাহিনী নিয়ে অনেক সময় আলোচনা করেছি।

পরিশেষে বলব,এটা আমার প্রথম পূর্ণাঙ্গ একটি বই।যদিও কাগজের কোনো বই নয়।পাঠক বন্ধুরা,বইটি পড়তে শুরু করার জন্যে অনেক ধন্যবাদ।মতামতের অপেক্ষা থাকল।

১

শোভন নিজেও ভুলে গেছে—ঠিক কবে থেকে সে সমাজ নিয়ে ভাবতে শিখেছিলো?কোন টানে তার এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়া?কিন্তু দীর্ঘ বলাটা কি ঠিক হবে?ওর বয়স এখন বত্রিশ।এই তিন মাস হল কলেজের শিক্ষকতার জন্য নিয়োগ হয়েছে ওর।এখনো কেমন যেনো মনে হয়,এই তো কয়দিন আগে সন্ন্যাস নিয়ে একেবারে বনে চলে যাবার স্বপ্নে মগ্ন ছিল সে!

স্বামী বিবেকানন্দ—যাঁর রচনাবলী কিনেছে একটার পর একটা;পড়ে গেছে কী এক অদম্য কৌতুহলে।সেই শোভন, এখন নিজের মধ্যেই দেখে বড় অদ্ভুত পরিবর্তন! সে নিজেও মনে করে,মানুষের চিন্তাধারার এমন পরিবর্তনই মানুষকে গতিশীল করেছে;সত্যতাকে এগিয়ে নিয়েছে।

ছেলেবেলা বেশ ধার্মিকতার আবহে কেটেছে শোভনের।তাই ওর মধ্যেও দেখা যেতে থাকে ধর্মের প্রতি মোহ।অনেকেই ওই কাচা বয়সে এত ধর্মের কথা,ঈশ্বরের কথা ওর মুখ থেকে শুনে অবাক বনে যায়। শুনিয়ে যায় কত গল্পগাথা, কত উপাখ্যান। রামকৃষ্ণ কথামৃত,গীতার কর্মযোগ কিংবা রামায়ণ-মহাভারতের কোনো বিশেষ পর্ব ওর মুখে ।মাঝে মাঝে চোখে জলও এসে যায়।জীব জগতের মুক্তির জন্য ওর মায়া হয়।জীবের বদ্ধতাকে ওকে কষ্ট দেয়।বিশেষত মানুষের সংসারের বদ্ধতা!

এখন মাঝে মাঝে এই সব নিয়ে ভাবলে ও নিজেই নিজের কাছে নতুন হয়ে

যায়।তবে সেখানে সে খুজে পায়,সুগভীর অন্ধকার থেকে আলোর জগতে আসার এক আনন্দপূর্ণ অনুভূতি।তবে শোভন এখন একটা ব্যাপারে অভ্যস্ত।নিজেকে অন্যের পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে ভাবতে পারে সে।তাই অন্যের চিন্তার সীমানায় সহজেই প্রবেশ করে ফেলে।সে জানে, ঈশ্বরের ব্যাপারে ওরা অন্তত কোনো সন্দেহ করতে রাজি নন।আর এটা করা যে রীতিমতো অপরাধের তাও তারা জানিয়ে দিতে চায়।

এখন শোভন দেখে অন্য স্বপ্ন।স্বপ্নেরও যে রূপান্তর হয়, তা সে নিজের জীবন দেখেই বুঝে গেছে।এখন ওর মনে হয়−শিশুদেরকে বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলাতেই একমাত্র পথ।কেননা যাদের বয়স হয়েছে, তারা পরিবর্তিত হবে না।কিন্তু যারা এখন ছোট, তাদেরকে যদি সঠিক শিক্ষার পরিবেশ দেওয়া যায় তারা নিশ্চয় এক সময় সমাজের কান্ডারী হবে।সমাজ নিয়ে অবিরাম ভেবে চলার সৌজন্যে এটা মনে হয়েছে তার। এটাই একমাত্র পথ−সমাজকে যাবতীয় অন্ধকার থেকে মুক্তি দেবার।আর সেই কথা ভেবে এই শিক্ষকতা পেশায় আসা ।

অনেক বাধার পাহাড় ডিঙিয়ে দেখতে পাওয়া সূর্যের মতো−এখন সে শিক্ষক।এতে অবশ্য কোনো অতিরিক্ত গর্ব নেই শোভনের।তবে একটা তৃপ্তি আছে ।অনেক কিছু করতে পারার।অনেক স্বপ্ন পূরণের আলোকচ্ছটা দেখতে পারছে সামনে।

বাকুড়াতে বাড়ী ওদের।মা বাবা ওখানে থাকেন।বড় দিদির বিয়ে হয়েছে বনগাঁতে।মাঝে মাঝেই সেখানে গিয়ে বেড়িয়ে আসে।ওখানকার মাঠের সবুজ শোভনকে টানে।যখন বিকেলের রোদ পাটক্ষেতের উপর এসে পড়ে, মিহি বাতাসে তাদের পাতারা দোলে−কেমন একটা উন্মাদনা জেগে ওঠে মনে।

তবে কলকাতার সাথেও মিশে গেছে অবলীলায়।প্রথম প্রথম দম বন্ধ হয়ে আসতো।মনে হতো ফিরে চলে যাই গ্রামে।কিন্তু ধীরে ধীরে বইয়ের গন্ধ আর কলেজ বন্ধুদের সঙ্গে মিশতে মিশতে কখন যে কলকাতার প্রেমে পড়ে গেছে, সে নিজেই জানে না।এক সময় কলকাতা ছিল একটা স্বপ্ন।সেই কলকাতার কত পথ এখন চেনা ওর।মাঝে মাঝে কলকাতা নিয়ে দু এক লাইন মনে মনে সাজিয়ে ফেলে:

তুমি বিস্ময়ী করেছো আমার দুচোখ

দেখেছি যতোই তোমারে;

তোমার পথে যতই হেটেছি

চিনেছি ততই আমারে।

এমন কত এলোমেলো শব্দেরা এসে যায় ওর মনে।লিখে রাখা হয় না।নিজের উপরে সে ভরসা যেন এখনো জন্মায় নি ওর।তবে এক সময় প্রচুর লিখতো।তখন আবেগী মন।বাংলা সাহিত্যে যতই ডুবেছে, যতই জেনেছে ততই যেনো ওর কলম থেমে গেছে।এটা সবার হয় কিনা শোভন জানে না। তবে বাংলা সাহিত্যের ছাত্র হবার সুবাদে ওর এটা হয়েছে।আগে কত কবিতা লিখে ফেলতো –এখন একটা কবিতা লিখতে গেলে ছন্দ সচেতন হয়ে ওঠে মন,উপমার কত কথা ভর করে মাথায়।শেষে কবিতাই লেখা হয় না।

বিদ্যাসাগর কলেজে বাংলা নিয়ে পড়েছে সে।ওর একটা অদ্ভূত নেশা আছে–লেখকের মন নিয়ে ভাবা।সে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই হোক আর নজরুলই হোক।ওর মনে হয়,কেউ যদি লেখককে প্রকৃত পক্ষে চিনতে পারে তাহলে তার রচনা বুঝতে পারাটা খুব সহজ হয় ।

তবে শোভন আগাগোড়াই স্বাধীন চিন্তায় বিশ্বাসী।অধ্যাপক একটা কিছুর একরকম মানে বলে গেলে,শোভন চোখ বুঝে তা কোনোদিন মেনে নেয় নি।সেটা নিয়ে নিজের মতো করে ভেবেছে।ভেবে ভেবে দাড় করিয়েছে একটা থিওরি।

রবীন্দ্রনাথকে সবাই এখন কেমন যেন দেবতার আসনে রাখেন।কিন্তু ওর অভ্যেস, একেবারে সাদাসিধে রবীন্দ্রনাথকে খুজে ফেরা।যাকে রক্ত-মাংসের মানুষ বলে মনে হয়।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস যে ছাত্রছাত্রীদের কাছে এমন লাগে;এর কারণ ওর মনে হয়,আসলে ছাত্রছাত্রীদের ইতিহাস খোজার ইচ্ছেটাই নাই।এই ইচ্ছেটা

জাগানোই তো শিক্ষকের কাজ।আর এই কয়দিন ধরে প্রতিটি ক্লাসে সেটাই করছে সে।

ছাত্রছাত্রীদের রেসপন্স ওকে মুগ্ধ করছে।ওদের মনে যেন কত কল্পনার মেঘ জমা হচ্ছে,কখনো সমাজকে দেখতে শিখছে কুৎসিত-কদাকার এক ব্যবস্থা হিসেবে,আবার সেই সমাজেই ফিরে যাচ্ছে।এই তো ক্লাস।এই তো শোভন।

কলেজে এখনো নতুনত্ব যায় নি ওর।জায়গা করে নেবার অভিপ্রায়ে নয়,জাগিয়ে তুলবার নেশাতেই সে যেনো আরো রাত জাগতে চায়। ধীরে ধীরে আলো জ্বালাতে চায়।ওই তো পিছনের বেঞ্চ থেকে কেউ বলছে,"স্যার,বইটা লাইব্রেরিতে পাবো তো?"

২

প্রথম প্রথম কয়দিন কলকাতা থেকেই যাতায়াত করেছে।কিন্তু আসা-যাওয়াতে সময় চলে যায় ।ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়ে ।বিশেষত ট্রেনের ভিড়ের সাথে এমন নিয়মিত সংযোগ আগে কোনোদিন না থাকায় বড় বিপাকেই ছিল সে।অবশেষে কলেজের কাছেই একটা ঘর ভাড়া নেয় ।দোতলা বাড়ী।মাস্টার মশাইয়ের।নিচের তলায় একলা মানুষ থাকেন।ছেলে দিল্লীতে। স্ত্রী ছেলের সাথেই থাকেন।মাস্টারমশাইকে কতবার বলেছে ওখানে চলে যেতে।নাছোড়বান্দা তিনি,"ওখানে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে।এখানে আছি।যতদিন পারি এখানেই থাকি।"

রেখা দিদি রান্না করে দিয়ে যায়।শোভনও একা একা রান্না করে না।মাস্টারমশাই ওকে পেয়ে বেশ খুশি।সকালে উঠেই বাজারে যান। তবে টাকা চান না।একদিন শোভন বলেছে,"মাস্টারমশাই,আপনি মাসের যাবতীয় খরচ একটু লিখে রাখবেন।"

মাস্টার উড়িয়ে দিয়ে বলেন,"আরে বাদ দাও।"

—"না না,তা হবে না।খরচ তো হয়ই।আর যদি আপনি এমন করেন, তাহলে—"

হাত নাড়িয়ে, না না বলেন তিনি।দিকে তাকিয়ে শোভন বুঝতে পারে, অনেক না বলা কথা বেরিয়ে আসতে চাইছে ভিতর থেকে।সেই দেশভাগের সময়।কতই বা বয়স হবে তার।তবুও মনের মধ্যে,সেই যে হেটে হেটে এদেশের মাটিতে আসা—এই যে বয়সী স্মৃতি একটুও যেন ভুলে যায় নি।তখন পাকিস্তান -ভারত।চারিদিকে যেন একটা চাপা ভয় গুমরে বেড়ায়।নিরাপত্তা নেই।ওখানে যে অবস্থা ছিল,একেবারে খারাপ বলা যায় না।কিন্তু দেশে এসে পড়ে যায় দুর্বিপাকে।মা বাবা কোনোদিন হয়তো ভাবেই নি—এমন দুর্দিন আসবে।কিন্তু এলোই। এসে যায় যে।যখন মানুষের জীবনকে নিয়ে তথাকথিত রাষ্ট্রের নিয়ন্তারা খেলা করে;যেন দাবার গুটি এক একটি।সেই সময়ে কারো কাছে একটু ঠাই হয় নি।

প্রথমে যে ক্যাম্পে থাকতেন সেখানেই তালপাতা দিয়ে শুরু হল অক্ষর পরিচয়।মাস্টার ছিলেন, ননীগোপাল সাহা।ফরিদপুরে বাড়ী ছিল লোকটার।তখনই বয়স হয়ে গিয়েছিল ।তবে একেবারে সাদাসিধে মনের একজন মানুষ ছিলেন।হিংসা ছিল না;তবে শাসন করতেন।

"সেই তার কাছে যদি ওইটুকু না শিখতাম আজকে হয়তো আমি অন্যরকম হতাম।"বলতে বলতে তিনি যেন স্মৃতির ছায়াপথে হারিয়ে যাচ্ছিলেন।

শোভন তন্ময় হয়ে শোনে আর শোনে।সেদিন গুগল ম্যাপে মাস্টারকে সেই বরিশালে ওনার গ্রাম দেখালেন।নদী, হাটবাজার।একে একে সব চিনলেন।চোখে চশমা পরাটা যেন এতদিন বাদে স্বার্থক হবে।

"শোভন,সত্যি, কতদিন ভেবেছি একবার যাই ঘুরে আসি।কিন্তু কোথায় যাবো?সবাই তো একেএকে এদেশে চলে এলো।"

শোভনও আর কথা বলতে পারে না।ওরও ভিতরটা কেঁদে ওঠে।দেশ ছেড়ে আসাটা যত সহজ; সকলে ভাবে; আসলে তত সহজ নয়।

মনে পড়ে এক সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরেছে সে।টিয়েপাখির ছানা খুজে খুজে এনেছিল।সেটির তদারকীতে ব্যস্ত ছিল। মা বলল,"কাল, সকালে আমরা চলে যাবো।"

শোভনের তখন দুরন্ত বয়স। কোথাও যাবার জন্যে মনের কোণে সব সময় একটা তৃষ্ণা জমে থাকে।নতুনকে দেখার।মামা বাড়ী যেতেই না ওর কত ভালো লাগে।

"কোথায় মা?কোথায়?" শোভন কৌতুহলে জানতে চায়।

—"ইন্ডিয়াতে।"

ইন্ডিয়া তার কাছে নতুন নয়।কতবার শুনেছে আগে। তবে ভেবে পায় না,ইন্ডিয়া লাল না নীল!

শোভন এটুকু জানে কি একটা ঝামেলা হয়েছে।ওর বড় দিদি কলেজে আর যাবে না।বড়দিদিকে নিয়ে ওরা সবাই সকালে চলে যাবে।তাই একটু গোছগাছ চলছে বাড়িতে।

শোভনের মনে ভালো লাগছে।আহা,ইন্ডিয়া!কতদিন পরে দেখবে।কুসুমের কোথায় যেনো থাকে?রাঙা ঠাম্মাকেও মনে পড়ে গেলো! ওদের সাথে কতদিন পরে দেখা হবে!

কিন্তু মায়ের মন যেনো ভালো নেই।মুখে কোনো হাসি নেই।মামা বাড়ীতে যাবার আগে মায়ের মুখ এমন থাকে না।আগের রাতে কত উৎফুল্লতা নিয়ে গোছগাছ করে।শোভনের একটু খারাপ লাগে।কিছু বলতে পারে না।

সেই যে শোভনেরা এলো;আর যায় নি।বাবা মাঝে একবার ভিটের কিছু টাকা আনতে গিয়েছিলো।কিন্তু সে ভিটে এখন দখলে চলে গেছে।কার কাছে টাকা চাইবে?

শোভনের মনে নেই অনেক কিছুই।তবে ভুলেও যাই নি একেবারে।যা যা মনে আছে তাইই ওকে নাড়া দেয় বার বার।ঠিক যেমন ঝিরিঝিরি বৃষ্টিতে হালকা হাওয়া গাছের পাতাগুলোকে দোল দিয়ে যায়!

মাস্টারমশাইয়ের সেই কথাগুলোতে যেন বাবার আক্ষেপই দেখতে পায় সে।কিন্তু কি অদ্ভুত ব্যাপার—তিনি তো কত দিন আগে এসেছেন।অথচ সেই যে ব্যাথা তা যেন এখনো ছুয়ে আছে তার হৃদয়।শোভন একটু গভীরে জানতে চায়,"মাস্টারবাবু,এই যে ব্যাথা,এত দুঃখ —এর কি শেষ নেই?এ কি চলমান বেদনার স্রোতস্বিনী? "

মাস্টারমশাই বলে,"কি বলব তোমায় —এর মূলে তো বিভেদ; মানুষে মানুষে হানাহানি।আচ্ছা,সেই সময়ে দেশভাগের মূলে কি ছিল—হিন্দু-মুসলমান?ধর্ম? "

"হুম", চশমার ভিতরে এক দৃষ্টিতে চোখ রেখে সায় দেয় সে।তারও তো তাই মনে হয়। মানুষ হিসেবেই নিজেকে দেখে।সবাইই তো মানুষ।ধরা যাক,সেই পৃথিবীর শুরুর মূহুর্তটা। তখন তো মানুষের চিহ্নমাত্রা ছিল না।অন্যান্য জীবনও আসতে অনেক সময় লেগে গেছে।আর মানুষ তো তার কত পরে।কিন্তু যখন মানুষ এলো,তখন কি এই হিন্দু-মুসলিম ছিল?ছিল না?অর্থাৎ সেই দৃষ্টিতে দেখলে আমরা সবাই তো এক।

আর এত বিভেদ—এর মূলেও তো ভাসাভাসা অতীতজ্ঞান বা অন্যের মিথ্যে প্রচারণা; যা ছোটবেলা থেকে মানুষ শেখে।এখন যেন ওর মনে হয়," মানুষ বিভেদছাড়া থাকতে চায় না।অন্যকে হিংসা করেই যেন তার তৃপ্তি।" কিন্তু এটাও যে সব না;তাও সে জানে।সে নিজেকে দিয়েই বিচারটা করে। সে তো এখন কোনো ধর্ম মানে না।কিন্তু সেও তো মানবিক।সব মানুষকে সমান চোখে দেখতে পারে।অথচ এক সময় সে পারতো না।ধর্ম যেন একটা চশমা যে বিভেদকে খুব ভালো করে দেখতে সাহায্য করে।

প্রতিরাতেই এমন কত কথা হয় খেতে।দিদি রান্না করে রেখে চলে যান।আর প্রতিদিন খেতে খেতে দশটা বেজে যায়।কোনোদিন আরো সময় গড়িয়ে যায়।তবুও যেন এই প্রবীণ আর নবীণের কথা শেষ হয় না।কত কথা বাকী থেকে যায় ওদের।

৩

প্রতি রাতেই ঘুমোনোর আগে ভাবনার গভীরে তলিয়ে যায় শোভন।কোনো কোনো দিন রবীন্দ্রনাথ বাজতে থাকেন ধীর লয়ে।এক সময় চরম রবীন্দ্রবিরোধী সে এখন রবীন্দ্রনাথে অনেক কিছু খুজে নেয়।জীবনের অনেক সত্যের জন্য তাঁর দ্বারস্থ হতে হয়।বিশেষত গান গুলো যেনো বেঁচে থাকার

আবেদনে ভরা।বারবার শুনেও যেনো বিরক্তি লাগে না।বরং আরো শোনার জন্যে কান সদা প্রস্তুত হয়ে থাকে।

সন্ধ্যার দিকে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে।ক'দিন খুব গরম পড়ছিল।এখন চারিদিকটা ঠান্ডা।কোথা থেকে যেন আরো শিতল বাতাস শোভনের জানলা দিয়ে ঢুকছে।বেশিক্ষণ তাই জেগে থাকা হল না ওর।মূহুর্তেই ঘুমের রাজ্যে ডুব দেয় সে।কোথায় যেন হারিয়ে যায়।

মাঝরাতে হঠাৎ জেগে উঠে।জানালা খোলা থাকায় দমকা হাওয়া এসে তাতে লাগছে।আর শব্দ হচ্ছে।ওঠেই তাড়াতাড়ি জানালাগুলো বন্ধ করে আগে।নিচে মাস্টারমশাইয়ের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।কারেন্ট না থাকায় মোবাইলের ফ্লাশ জ্বেলে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে সে। মাস্টারমশাই এখনো বসে আছেন।

"উপরে গিয়ে তোমাকে ডাকবো যে,তার কায়দা নেই।এদিকে কারেন্ট নেই।লাইট হাতে উপরে উঠতে রাত্রে একেবারে পারি না।"

শোভন বুঝতে পারে মাস্টারবাবু নিচ থেকেই জানালার শব্দ শুনেছেন।হেসে বলে,"ঠান্ডা হাওয়ায় ঘুমিয়ে গেছি।সে জানালাগুলোতে না শব্দ হলে জাগতামই না।"

আর দুই একটা কথা বলে শোভন উপরে চলে যায়।চোখে ঘুমের নেশা ছিল।এমতোবস্থায় বেশিক্ষণ দাড়িয়ে থাকা যায় না।শুতে না শুতেই আবারো

গভীর ঘুমে তলিয়ে যায় সে।

ঘুমটা কেমন যেন ধরে গিয়েছিল।তাই সকালে উঠতে একটু দেরি হয়ে যায়।আর মাঝরাত্রে কিছু সময়ের জাগরণে ওর শেষের দিকের ঘুমটা একটু গাঢ় হয়।বাবা কতবার বলত,"শোভন,একটু ভোররাত্রে পড়ার অভ্যাস কর বাবা।" কিন্তু তা কোনোদিন হয় নি।দু'এক বার চেষ্টা করেছে যদিও।ভোররাত্রে যদি এক ঘন্টা পড়ে তো দিনের বেলায় ঘুমোতে হয় তিন ঘন্টা।না হলে মাথা ব্যাথা কিছুতেই যায় না।আর রাত জেগে পড়াটাও কেমন যেন দুঃস্বপ্নের মতোন ওর কাছে।বারোটা পেরোলেই মাথা আর কিছু নিতে পারে না।অনেক ব্যস্ততার মাঝে রাত্রির সময়টুকু এভাবে হেলায় কাটাবার জন্যে ওর একটা আফশোস আছে।কিন্তু সে জানে ওর ব্রেনের ব্যাপার হয়ে গেছে এটা।তাই আর জুলুম চালায় না।

আজকে ফার্স্ট আওয়ারেরই একটা ক্লাস আছে ওর।প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস।যদিও বিষয়টি আগে থেকেই বেশ জানা আছে।তবুও আরেকটু দেখে নেয়।ওর মনে হয় প্রতিটি ক্লাসই নতুন।নতুন ভাবে ভাবতে হয়।কেননা ক্লাসের স্টুডেন্টদের মনস্তত্ত্ব ওর কাছে খুব জুরুরী। ওদের মনের খবরাখবর নিয়েই ওকে নামতে হয় জ্ঞানের এই অভিযানে।তাছাড়া একটি কথা ছাত্র-ছাত্রীদের সে বারবার বলে,কোনো একটা বিষয়কে আয়ত্বে আনতে গেলে বিষয়টি নিয়ে তোমাদেরকে ভাবতে শিখতে হবে।যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের চিন্তাতেই বিষয়টা ধরা না দেবে ততক্ষণ পর্যন্ত মনে করবে শেখাটা সম্পূর্ণ নয়।

ক্লাস শুরু হয়েছে।ইতিমধ্যে বিষয়ের গভীরে চলে গিয়েছে প্রায়।ছাত্রছাত্রীরা আগ্রহভরে শুনছে নতুন শিক্ষকের কথা।শোভনও যেন কিছু সময়ের জন্যে নিজেকে একেবারে নিমগ্ন করে দেয়।

হঠাৎ হৈ-হুল্লোর আর স্লোগানের শব্দে সবাই কেমন যেন থমকে গেল।প্রথমত কেউই বুঝতে পারল না,কি হয়েছে।কয়েকজন ছাত্রছাত্রী বলাবলি করছিল। ওদের মধ্যে একজন বলল,"সংসদের ছেলেরা।"

শোভন নিজেও জানে।আজকে ওদের অনেকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা

গেছে।ওরা পড়ালেখা করার অভিপ্রায়ে আসে না কলেজে।আসে ক্ষমতার আস্ফালন শিখতে আর দেখাতে।ক্লাসের মধ্যেই শোভনের চোখ মুখ থেকে একটা চাপা ক্ষোভ ঠিকরে বের হয়ে আসছিল।কিন্তু তা প্রকাশ করে না।

বিষয়টাকে অপ্রাসঙ্গিক বলে উড়িয়ে দিয়ে আবার ক্লাসে মন দেবার মতো মানসিকতা শোভনের নেই।কেমন যেন অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ধরা দিল তার কাছে।ছাত্র-ছাত্রীরা শোভনের হাবভাব দেখে বিষয়টা বুঝে নেয়।একজন বলে,"স্যার, মনে হয় বিজয় মিছিল।ওদের দল নির্বাচনে জয়ী হয়েছে তাই। "

"আচ্ছা,এরা কি জানে না, এখন ক্লাস চলছে?"

—" স্যার,কলেজে কোনো একটা কাজে আমরা লাইনে দাড়াই।আর ওরা এসে এমনভাবে ধমক-ধামক দেয় যে নিজেদের সন্মানটুকুও থাকে না।"

—"আর ওদের কাজ আগে হয়ে যায়।কিভাবে হয়ে যায় তা জানা নেই।কেউ কিছু বলবে না।সবাই ওদের ভয় পায়।"

শোভন শুনে যায়। ছাত্রীরা এতক্ষণ কিছু বলছিল না।একজন বলল,"স্যার,মেয়েদের সাথে এমনও হয় যে,কথা বলতে না চাইলেও জোর করে কথা বলতে হয়।"

—"আবার অনেক মেয়েদের লাইনে পর্যন্ত দাড়ানো লাগে না।"একজন ছেলে বলে ওঠে।

বিষয়টা একটু হাসির পর্যায়ে চলে যায়।অনেকেই হেসে ওঠে।শোভন ওদের থামতে বলে।

চিরপ্রতিবাদী সত্ত্বা শোভনের।এসব শুনে যেন সেই গানের কলির মতো 'দেখে শুনে ক্ষেপে গিয়ে করি চিৎকার' করে শোভন বলে,"তা তোমরা কিছু করতে পারো না?"

—"কিভাবে করবো স্যার?মনে হয় ওরাই তো কলেজ চালায়।আমরা কিছু করতে গেলে আমাদের—"

—"সেদিন একটা ছেলেকে কি যে মার মারল। ফিজিক্স ডিপার্টমেন্ট পর্যন্ত

নিয়ে যায় মারতে মারতে।"

আর কিছু বলতে পারে না শোভন।মনটা রেগে ফেটে পড়তে চায় ।বলে," তোমরা এটুকু পড়ে এসো বাড়ী থেকে।আর মনে রাখবে,জ্ঞানই এক মাত্র তোমাদের অস্ত্র।জ্ঞানচর্চাতেই তোমাদের মুক্তি। "

—"স্যার, রাজনীতির দাদাদের কাছে ওসব জ্ঞান-ফ্যানের কোনো মূল্য নাই।"

শোভন এই কথায় অবাক হয় না। তাই আর কিছু না বলে বেরিয়ে আসে ক্লাস থেকে।

স্টাফরুমে বাংলা ডিপার্টমেন্টের প্রায় সবাই ছিল।

অবনী দা, HOD ম্যাডাম,বিকাশ স্যার, দেবিলীনা দি, অপর্ণা দি সবাই ছিলেন। সবাই খোশ মেজাজে ছিলেন।শোভন রুমে ঢুকেই বুঝতে পারেন, ওখানেও আলোচনা হচ্ছে মিছিল প্রসঙ্গে।

আসলে বাইরে থেকে শিক্ষকদের অনেকে মনে করেন একেবারে শান্ত প্রাণী।খাবেন-দাবেন, স্কুল-কলেজ করবেন।এর বাইরে আর কি?কিন্তু তারাও যে সামাজিক মানুষ; সমাজ নিয়ে তারাই যে বেশি মাথা ঘামান এটা বোধহয় রাজনীতির পান্ডারা ভুল ভেবে বসে আছেন।তারাই যে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে আলোর মশালের বহমানতা বজায় রাখে এই সত্যটাও অনেকে বিস্মৃত হন।ক্ষমতা—এমনই ভয়ানক কিছু!

সহকর্মীদের সবার মধ্যেই ক্ষোভের আগুনের আচ করা যাচ্ছিল।শোভন কলেজে নতুন হলেও ইতিমধ্যে অনেকের সাথে ওর ভাব হয়েছে।অবনী দা তো ওকে প্রায় ভাইয়ের মতো স্নেহ করেন।

অপর্ণা দিদিকে কি বলে সম্বোধন করবে তাই নিয়ে একটু দ্বন্দ্বে ছিলো কিছুদিন। কেননা অপর্ণা ওর এক বছর আগে জয়েন করলে মনে হয় না শোভনের থেকে বয়সে বড় হবে।তবুও যোগদানের বয়সে সে বড় সেই যুক্তিতে তাকে দিদিই বলে।এটা নিয়ে সংশয়ের একটা কারণ হল,অপর্ণাকে শোভনের একটু কেমন যেন ভালো লাগে।ঠিক জানে না ওর বিয়ে হয়েছে কিনা।তবে শাড়ী পরে প্রতিদিন কলেজে আসে।যত ওকে দেখে শোভন ততই যেন অবাক

হয়।ওকে বারবার তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে হয়।মাঝে মাঝে মনে হয়,একটু কথা বলি,কিন্তু কেমন যেন ওর সংকোচ হয়।অন্য স্যার-ম্যাডামেরা কি ভাববে তা নিয়েও শোভনের ভাবনা হয়।

হঠাৎ অপর্ণা বলল, "আমরাও তো এক সময় রাজনীতি করেছি।তবে আমাদের আধিকার বুঝে নেওয়াই ছিল আমাদের মূল লক্ষ্য।আর এরা?"

"এরা অধিকার কি তা জানে আদৌ?" অবণি দা প্রশ্ন তোলে,"তা জানলে তো অধিকারের প্রশ্ন আসবে?"

শোভন ভেবেছিল সে নিজে চুপ থেকে অন্যদের মতো শুনবে।কিন্তু অবণি দাদার কথার পরে কিছু না বলে কেমন যেন থাকতে পারল না।

"অবণি দা,এরা এটা জানে না কেন?এদের জানানোর পরিবেশ আমরা কি তৈরি করতে পেরেছি?"

অবণি দা বলে,"তা ঠিক আমরা পারি নাই।আসলে আমরা কি করবো?ওই যে যারা ক্যাডার গিরি করবে তাদের তো হাত পাকছে হাইস্কুলে থাকতেই।আমাদের এখানে এসে ভূমি পেয়ে যাচ্ছে।"

"আসলে অবণি দা, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থারই ঠিক নেই। তুমি কাকে দোষ দেবে?" অপর্ণা বলে।

স্টাফদের মধ্যে এমন গভীর আলোচনায় মেয়ে হিসেবে একমাত্র অপর্ণাই বেশি যোগ দেয় তা শোভন লক্ষ্য করেছে।আর তার কথায় যুক্তি থাকে।সেই জন্য তাকে মনে মনে সমর্থন করে।

আমাদের সমস্যাটা যে শিক্ষা নামক নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়াতেই শোভন তো বারবার সেটা বলতে চায়।তবে অপর্ণা যে সেটা ভেবেছে তা ভাবতেও শোভনের ভালো লাগছে।অনেকেই এই শিক্ষার গুরুত্বটা বোঝে না।আর না বুঝে উপরে উপরে নাড়া চড়া করে।এটা করলে ভালো হয়, ওটা করলে ভালো হয় বলে একেবারে একাকার করে ফেলে।

কথাবলবার সময় শোভন অপর্ণার দিকে তাকিয়ে ছিল।অপর্ণাও ওর দিকে

বার কয়েক চোখ ফেরায়।হাসি খুশি থাকার চেষ্টা করে সব সময়।তবে মাঝে মাঝে শোভনের কেমন যেন মনে হয়,অপর্ণার ঐ হাসির পিছনেও কোনো দুঃখের গল্প আছে।কিন্তু কিভাবে শুনবে তা?শোনোর মতো কোনো সুযোগই তো নেই আপাতত। আর শুনেই বা তার কী লাভ?তবে এও বুঝতে চায় না শোভনের মন।কেন যেন মনে হয়,অপর্ণা তার সেই স্বপ্নের মানবী।যাকে সে এত দিন, মনে মনে খুজে এসেছে।অপেক্ষা করে এসছে যার জন্য এই এতোটা পথ।

৪

কলেজ থেকে বেরোবার মুখে একটা দৃশ্য দেখে শোভনের ক্ষোভের আগুণে যেন ঘৃতাহুতি দিল কেউ।কলেজ ছুটি হয়ে গিয়েছে।শিক্ষকেরা একে একে বেরিয়ে যাচ্ছেন।

বেশিরভাগদেরই ট্রেন ধরবার তাড়া আছে।শোভনের সে তাড়া না থাকলেও মাথার মধ্যে একটা কিছু ঘুরে বেড়াচ্ছে।তা নিয়ে কিছু লিখবার জন্য ছটফট করছে।

দেখে গেটম্যান একটা মেয়েকে নানা ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করছে।অথচ কিছু ছেলেরা –যাদের চোখে, মুখে, গায়ে রঙ দিয়ে ঢাকা;কতবার কলেজ গেট দিয়ে যাতায়াত করছে।সে ক্ষেত্রে তিনি কিছু বলছেন না।আর কিই বা বলতে পারেন তিনি। এটা ঠিক যে,তিনি কলেজ রক্ষকের দায়িত্বে আছেন।কিন্তু তাই বলে ওদের ক্ষমতার উপরে না তো।তবে শোভন খেয়াল করেছে,গেটম্যান এটা নিয়ে নিজেও চিন্তিত। তিনি যে এটা যে,ভালোভাবে নেন তাও নয়।তার মুখ

দেখলেই বোঝা যায়, তিনি কিছুই করার ক্ষমতা রাখেন না।

রাজনীতির শিক্ষা কলেজ জীবন থেকেই যে হওয়া উচিত —সে ব্যাপারে ওর কোনো সন্দেহ নেই।বরং গণতান্ত্রিক চেতনা সেই ছোটবেলা থেকেই থাকলে ভালো হয়।কিন্তু এই যা চলছে তাকে রাজনৈতিক চেতনা বলা যায় না কোনোভাবে।এখন নিয়ম করে পুলিশও থাকেন গেটের কাছে।তবে তারা যেন কোনো ঝামেলা না হয় সেই জন্যে থাকেন।সেদিন খবরে বেরিয়েছে, এই কলেজের ছাত্রদের দু'পক্ষের লড়াইয়ের খবর।রেষারেষি এখনো আছে।এর শেষ হবে না।বরং বেড়েই যাবে।শোভন ভেবে পায় না কিভাবে কি করবে।তবে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে একটা প্রশ্ন বেশ জোরালো হয় মনের মধ্যে,মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা কেন রাজনীতিতে আসে না?

প্রশ্নটা নিয়ে ভাবতে হবে।ভাবতে ভাবতে লিখতে হবে।তাই ব্যাগটা রেখেই বসে পড়ে ল্যাপটপে।এখন খাতা-কলমের থেকে সে যেন কীবোর্ডেই বেশি এক্টিভ থাকে। এই অভ্যেস আগে ছিল না;ধীরে ধীরে হয়ে গেছে।

ল্যাপটপের নোটপ্যাড বের করে লিখে নেয় প্রশ্নটি।

"মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা কেন রাজনীতিতে আসছে না?"

উপরে সিলিং ফ্যান ঘুরে চলেছে।প্রশ্নটা বার কয়েক মনের মধ্যে আউড়িয়ে যায় ফ্যানের দিকে চেয়ে।কোনো বিশেষ বিষয় নিয়ে ভাবতে গেলে এটাই করে সে।তবে প্রথমে কি লিখবে ভাবতে থাকে।এক পর্যায়ে লিখে ফেলে প্রথম লাইন—

"আসলে রাজনীতি ব্যাপারটা আমাদের রাষ্ট্র কাঠামোয় তার রং পাল্টে ফেলেছে।"

আবার লিখে যায়-

"গণতন্ত্রের অনেক কিছুরই এখানে দেখা মেলা ভার।গণতন্ত্রের নামে তা এখন

ক্ষমতার হাতিয়ার।এখন একটা ধারালো অস্ত্রের কথা ভাবা যাক একটু—যার বাহকের সেই অস্ত্র ব্যাবহারের জ্ঞান নেই।অথচ হাতে থাকলে তা ব্যবহার করতেই হয়। ব্যাপারটা কেমন হবে?নিশ্চয়ই ভয়ংকর কিছু।সে তার স্বেচ্ছাচারিতায় হয়ে উঠতে পারে এক বিভীষিকা। আর আমাদের রাজনীতির বেলাতেও এটা হচ্ছে।আমরা যাদেরকে সামনের সারিতে দেখছি তাদের রাষ্ট্রপরিচালনের ব্যাপারে নূনতম জ্ঞানটুকুও নেই।অথচ তাদের হাতেই সব।তবে এটা ঠিক জনগণ তাদেরকে নির্বাচিত করে।আর জণগণের এই নির্বাচনে কতটা স্বচ্ছতা থাকে তাও দেখবার বিষয়।সত্যটা হল,আমরা পড়ে গেছি একটা অজ্ঞতার চক্রে।যারা রাজনীতিতে আসছে তারা অজ্ঞ।আর এই অজ্ঞতার মাসুল গুনতে হচ্ছে সর্বস্তরের সবাইকে।কিন্তু এর বাইরে বেরোতে চাইলেও বিপদের কালো মেঘ জমা হয় মহুর্তে।কেননা অস্ত্রের ক্ষমতা যে দুর্বিনীত তা এই সব রাজনীতিকদের বেশ জানা।যে ছেলেটা বা মেয়েটা পড়ালেখায় মনোযোগী, সে কি এই রক্তের হোলিখেলায় নাম লেখাবে?কখনোই না।ফলে, যা হবার তাইই হচ্ছে।যতসব কাঠমুর্খ এসে ভিড় করছে রাজনীতির ময়দানে।ক্ষমতার দাপটে প্রাচীন ডায়নোসরের মতো চরিয়ে বেড়াচ্ছে।কেউ কেউ আবার এদের স্তুতিতে একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ। আর এই সব মেধাবীর দল তাও করতে পারে না।তাতে তাদের সময় কোথায়?আর অবিভাবকেরাও তো ভয়ে থাকেন ।ফলে রাজনীতিকে উত্তোরণের বদলে বিপথগামীতা হিসেবেই দেখে থাকে তারা।আর এই জন্য তারা আসছে না কলেজের রাজনীতিতে।"

লেখাটা কয়েকবার পড়ে।আসলে এ লেখায় কোনো তথ্যের জন্য নয়,নিতান্ত মনের মধ্যে যে বহ্নি জ্বলছিল তারই উত্তাপ।এর আগে কোনো দিন বাংলা ডিপার্টমেন্টের WhatsApp গ্রুপে শোভন কিছু লেখে নি কোনোদিন। সবাই কম বেশি বলে।তবে আজকে মনে হল,লেখাটি অন্তত সহকর্মীদের একটু হলেও জানানো উচিত। ওর মনে যে ঝড় বইছে,অন্যের মনের সেই হাওয়া বইছে কি না তাও জানা উচিত।

একটু পরে দেখে অনেকেই লেখাটি সমর্থন করে নানান কিছু লিখছে।অপর্ণা দিদি কি লেখে সে বিষয় অধীর আগ্রহ ছিল ওর।সে জানে অপর্ণা দিদি সব সময়েই ইউনিক।তার লেখা একটা শব্দও তার কাছে অনেক।

অবশেষে বেশ রাত্রের দিকে,অপর্ণা দিদি জবাবে লেখে,"সত্যি কথা হল,এখন আমাদের সামনে দুটো পথ—ছাত্রছাত্রীদের গণতান্ত্রিক চেতনায় জাগিয়ে তোলা অথবা একেবারে কিছু না কথা বলা।কথা বললে কিছু করতে হবে।"

দেবলীনা দি বলে,"অপর্ণা,আমরা কিছু করতে গেলে আমাদের চাকরী নিয়ে টানাটানি বেঁধে যাবে শেষে।আমাদের তো হাত বা বাধারে অপর্ণা।"

সেটা সবাই জানে।এই জন্য বোধহয় কেউ কিছু এতোদিন বলে নি।শোভন হঠাৎ করে কিছু লেখে না।অপর্ণা দিদির জবাবটা ভালো করে পড়ে কয়েকবার।আসলেই তো,কিছু করা ছাড়া আর কিই বা আছে।

কিন্তু গ্রুপে গা বাঁচিয়ে চলা অনেকেই আছেন।ইতিমধ্যে শোভন তা বুঝে গেছে।তাই ওখানে কিছু বলা সমীচীন মনে করল না । অপর্ণা দিদিকে আলাদা ভাবেই লিখল-

"অপর্ণা দি,ওখানে কিছু বলে বোধহয় লাভ হবে না। মনে সবার ভয় আছে।সবারই তো সংসার আছে!"

এটা যে শোভনের ব্যাঙ্গার্থক কথা তা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের মেধাবী স্টুডেন্ট অপর্ণার বুঝতে মোটেও বেগ পেতে হয় না।

"ঠিকই শোভন।এভাবে আর কতদিন চলা যায়?সত্যি কিছু একটা করতে হবে।ওদেরকে বলে লাভ নেই।এক সময় অনেক আন্দোলন করেছি।এদের মনস্তত্ত্ব আমার অনেক আগে বোঝা হয়ে গেছে।আমাদের শিক্ষকদের অন্তত মাথাটা ছিল।এই জন্য তাদের কাছ থেকে অন্তত প্রতিবাদ শিখেছিলাম।শিখেছিলাম, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াবার সাহস।আর আমরা ছাত্রছাত্রীদের কি শিক্ষা দিচ্ছি? "

"দিদি, একটা কিছু শুরু করতে হবে।সেই নজরুলের কবিতাঃ

'আমরা যদি না জাগি মা কেমনে সকাল হবে?' "

—"তাইই শোভন,আমরা যখন যাদবপুরে পড়তাম—পড়ালেখা, রাজনীতি সবই করতাম।সত্যি বলতে কি—বিদ্রোহী মনগুলো অনেক কিছুই করতে পারে।মনে যদি বিদ্রোহ না জাগে তবে এই সমাজে তাকে আমার ক্লীব বলে মনে হয়।আচ্ছা,শোভন,বেঁচে থাকাটা কিসের জন্য?"

অপর্ণা দিদির সাথে যতোই কথা বলছে ততোই যেন তার গভীরে ডুব দিচ্ছে শোভন।কেমন যেন একটা শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসছে।ভাবনার এতো যে মিল হতে পারে তা ওর কেমন যে বিশ্বাসই হয় না।এতোদিন সে ভাবতো,মনে হয়, সে একটু কেমন যেন;ওর ভাবনাগুলোর মূল্য নেই কারো কাছে।সে যে সবার মাঝে একেবারে অপাঙক্তেয় এটা ভেবে সে মনে মনে একটু অসস্থিতে থাকতো।কিন্তু অপর্ণা দি তার সেই ভুলে গড়া ইমারত ভেঙ্গে দিয়ে বলে,"শোভন , গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে এরা চলে যাবে।এদের পরবর্তী প্রজন্মও চলে যাবে।কিন্তু কিছুই হবে না।দুর্নীতি বেড়েই যাবে।অথচ কথা ছিল অন্য কিছু।রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লার কবিতা পড়েছো?দাড়াও ওনার একটা কবিতা তোমাকে পাঠাই।"

শোভন শুনেছে রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ নাম।স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে যে ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে এসেছিল সেই ঝড়ে যে ক'জন সাহিত্যের নাবিকেরা শক্ত করে হাল ধরেছিলেন, রুদ্র তাদের অন্যতম।তার অনেক কবিতার সাথে শোভনের পরিচয় আছে।কিন্তু অপর্ণা দিদির কাছে এই তিনি এতটা গুরুত্বের তা তো জানতো না।আসলে মানুষের মন এমনই।তার মানসিকতায় তার প্রয়োজনীয় যা কিছু খুজে নেয় তা।কিন্তু একটা ব্যাপার ভেবে শোভনের খারাপ লাগে,ইদানীংকালে বাংলা সাহিত্যেও কেমন যেন পূর্ব-পশ্চিমের সীমানা দ্বারা পৃথকের আভাস পাওয়া যাচ্ছে।তবে এসব যে কালের বিশাল পরিধিতে ঠাই পাবে না,সে ব্যাপারেও সে আশাবাদী।

একটু পরে অপর্ণা দি কবিতা পাঠিয়ে দিলো।কবিতার নাম—'কথা ছিল সুবিনয়'।

'কথা ছিলো রক্ত-প্লাবনের পর মুক্ত হবে শস্যক্ষেত,

রাখালেরা পুনর্বার বাশিঁতে আঙুল রেখে

রাখালিয়া বাজাবে বিশদ।

কথা ছিলো বৃক্ষের সমাজে কেউ কাঠের বিপনি খুলে

বসবে না,

চিত্রর তরুন হরিনেরা সহসাই হয়ে উঠবে না

রপ্তানিযোগ্য চামড়ার প্যাকেট।

কথা ছিলো , শিশু হবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সম্পদের নাম।

নদীর চুলের রেখা ধরে হেঁটে হেঁটে যাবে এক মগ্ন ভগীরথ,

কথা ছিলো, কথা ছিলো আঙুর ছোঁবো না কোনোদিন।

অথচ দ্রাক্ষার রসে নিমজ্জিত আজ দেখি আরশিমহল,

রাখালের হাত দুটি বড় বেশি শীর্ণ আর ক্ষীণ,

বাঁশি কেনা জানি তার কখনোই হয়ে উঠে নাই-

কথা ছিলো, চিল-ডাকা নদীর কিনারে একদিন ফিরে যাবো।

একদিন বট বিরিক্ষির ছায়ার নিচে জড়ো হবে

সহজিয়া বাউলেরা,

তাদের মায়াবী আঙুলের টোকা ঢেউ তুলবে একতারায়-

একদিন সুবিনয় এসে জড়িয়ে ধরে বোলবেঃ উদ্ধার পেয়েছি।

কথা ছিলো, ভাষার কসম খেয়ে আমরা দাঁড়াবো ঘিরে

আমাদের মাতৃভূমি, জল, অরন্য, জমিন, আমাদের

পাহাড় ও সমুদ্রের আদিগন্ত উপকূল-

আজন্ম এ-জলাভূমি খুঁজে পাবে প্রকৃত সীমানা তার।

কথা ছিলো, আর্য বা মোঘল নয়, এ-জমিন অনার্যের হবে।

অথচ এখনো আদিবাসী পিতাদের শৃঙ্খলিত জীবনের

ধারাবাহিকতা

কৃষকের রন্ধ্রে রক্তে বুনে যায় বন্দিত্বের বীজ।

মাতৃভূমি-খন্ডিত দেহের পরে তার থাবা বসিয়েছে

আর্য বণিকের হাত।

আর কী অবাক! ইতিহাসে দেখি সব

লুটেরা দস্যুর জয়গানে ঠাঁসা,

প্রশস্তি, বহিরাগত তস্করের নামে নানারঙা পতাকা ওড়ায়।

কথা ছিলো 'আমাদের ধর্ম হবে ফসলের সুষম বন্টন',

আমাদের তীর্থ হবে শস্যপূর্ণ ফসলের মাঠ।

অথচ পান্ডুর নগরের অপচ্ছায়া ক্রমশ বাড়ায় বাহু

অমলিন সবুজের দিকে, তরুদের সংসারের দিকে।

জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যায় আমাদের ধর্ম আর তীর্থভূমি,

আমাদের বেঁচে থাকা, ক্লান্তিকর আমাদের দৈনন্দিন দিন।'

"শেষে লিখে দিলো গুগল থেকে কপি পেস্ট করে দিলাম।"

কবিতাটি পাঠিয়ে এই মেসেজটি করে অপর্ণা।

শোভনের আবৃত্তিতে কোনো প্রশিক্ষণ না থাকলেও নিজে নিজে আবৃত্তি করে অনেক কবিতাই।এই কবিতাটি পড়তে পড়তে ওর মনের অন্দরমহলে যেন বজ্রপাত হচ্ছিল বারেবারে।রক্ত গরম হচ্ছিল।এটা ঠিক সে এখন কলেজের অধ্যাপক। তবে আবেগের দোলা তো তারও লাগে।সজাগ হয়ে ওঠে এক বিদ্রোহী অনুভূতির পরশে।

"দিদি,কথা ছিল,আমাদের ধর্ম হবে ফসলের সুষম বন্টন।"

—"হুম শোভন,,শুভ রাত্রি।"

সত্যি সত্যি এত রাত হয়ে গেছে শোভন ভাবতে পারে নি।মাঝে মাস্টারমশাইকে ফোন করে খেয়ে নিতে বলেছে।মোবাইলেও চার্জ প্রায়

নিঃশেষ।

"হ্যা দিদি,শুভ রাত্রি।ভালো থেকো।কাল কলেজে কথা হবে।"

উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে নেট অফ করে চার্জে রেখে দেয় ফোনটি।সিঁড়ি ধরে নেমে নিচে খেতে আসে সে।

এতক্ষণ কি এক আবেশে সে ছিল যেন।অপর্ণার মুখটি কেমন যেন স্পষ্ট দেখতে পারছে সে।এটা ভাবতে ওর ভালো লাগছে,অন্তত কেউ একজন কে পেয়েছে,যার উদ্যম আছে।কিছু করার সাহস আছে।ভীরুতা যার কথাতে একেবারে নেই।

খেতে খেতে এই সব মাথার মধ্যে বারবার ঘুরছিল।কালকে সকালে যে অপর্ণাকে দেখবে, সে যেনো আরো পরিচিতা আরো আলোকিতা একজন।

৫

সকালে চা না খেলে যেনো শোভন চাঙ্গা হয় না মোটে।কলকাতা থেকে এই দীর্ঘ্য অভ্যেস নিয়ে এসেছে।এখানেও প্রতিদিন সকালে উঠে চায়ের হিসেব কষে মগজ।এক কাপ চা খাবার পরে যেনো তরতাজা হয়ে ওঠে শরীর,মনও হয়ে ওঠে ফুরফুরে।

সকালে চা খেয়েই সে ভাবল,যাইহোক কাজ শুরু করা যাক আগে।অবশ্য সকালে কিছুটা বিছানায় শুয়ে চিন্তার অভ্যাসটা চা খাওয়ার থেকেও পুরাতন। নতুন নতুন অনেক আইডিয়া এই বিছানায় শুয়ে শোভনের এসেছে।তবে সে এও জানে,করি করি করে অনেক কিছুই করা হয় না।তাই নিজের কাজের মাধ্যমে নিজের কর্মক্ষমতা দেখেই তবেই নিজের উপর আস্থা রাখতে চায়

সে।এর আগে পড়ার সময় এটাই করতে।নিজে খানিকটা পড়ে তবেই নিজের উপর বিশ্বাস জন্মাত।

অনেক কল্পনা, অনেক রুটিন পণ্ড হবার পর সে বুঝতে শিখেছে আমাদের মন শৃঙখলপ্রিয় নয় তবে কাজপ্রিয়।কিন্তু তার জন্য মনকে নিয়মের কঠোরতা নয়,তার ক্ষমতার একটা আভাস দেওয়াতেই বেশী কাজ দেয়।তাই আজও সে সকালে একটা ব্যাপার ভেবেছে, ভিডিও ক্লাস তৈরি করবে। একেবারে ছোটদের থেকে শুরু করবে।কেননা,এটাই আপাতত ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌছনোর একটা পথ তার কাছে।তাছাড়া এর উপর একটা ভাবনাও শোভনের আছে:

গ্রামের দিকে একটা পরীক্ষামূলক স্কুল শুরু করবে।যেখানে কোনো শিক্ষক নয়।মূলত তার ভিডিও ক্লাসগুলো দেখেই শিখবে শিক্ষার্থীরা।তবে তার আগে সে বেশি জোর দিচ্ছে,ভিডিও ক্লাস নির্মাণে।সাহিত্য,সমাজবিদ্যা,ইতিহাস-ভূগোল, বিজ্ঞান,অঙ্ক-সমানে ভালো লাগে শোভনের।ওর মনে হয়,কেউ যদি সাহিত্য পাঠে অভ্যস্থ থাকে আর তার যদি সাহস থাকে তবে সে নিজে নিজে যে কোনো বিষয় পড়তে পারবে।সে স্কুল কলেজ পর্যায়ের অনেক বিষয় বলতে গেলে অধিকাংশ বিষয় বই পড়ে শিখেছে।তখন এখনকার মতো মোবাইল না ইন্টারনেটের এত রমরমা ছিল না।আর এই জন্য সে সব কিছু পড়াতেই দক্ষ।তবে যে কোনো বিষয় পড়ানোর আগে তার লেসন প্লানিংয়ে শোভন খুব জোর দিয়ে থাকে।ও বলে-

এটা ঠিক যে বিষয়বস্তু বছরের পর বছর ঠিক থাকে। কিন্তু একজন শিক্ষকের সামনের যারা স্টুডেন্টস তারা তো পাল্টে যায়।কত নতুন নতুন মুখ।কত বিচিত্র স্বভাব তাদের।কালিদাস রায়ের সেই ছাত্রধারা' কবিতার মতোঃ

"স্মরিয়া খেলার মাঠ   কেউ ভুলে যায় পাঠ,

বুদ্ধিতে বা কারো না কুলায়,

কেহ স্মরে গেহকোণ,   স্নেহময় ভাইবোন—

ঘড়ি-পানে ঘন-ঘন চায়।

ডাকিছে উদার বায়ু   লয়ে স্বাস্থ্য লয়ে আয়ু,

ডাক শোনে বসে রুদ্ধ ঘরে,

হাতে মসী, মুখে মসী,   মেঘে ঢাকা শিশু-শশী—

প্রতিবিম্বে মোর স্মৃতি ভরে।

আর সবি গেছি ভুলি,   ভুলিনি এ মুখগুলি,

একবার মুদিলে নয়ন

আঁখিপাতা ভারি-ভারি,   ম্লান মুখ সারি-সারি

আকুল করিয়া তোলে মন।"

তবে ভিডিও ক্লাসের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়।ফলে আরো বেশি সতর্ক থাকতে হয়।কিন্তু এর অনেক সুবিধা আছে।কোনো শিক্ষার্থীকে যদি মনে হয়,তার পূর্বজ্ঞানের অভাব আছে।তাহলে তাকে পূর্ববর্তী ক্লাসগুলোতে দক্ষ হতে হবে।শোভনের একটা ব্যাপার বারবার মনে হয়—আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার গলদের জন্য হাজার হাজার ছেলেমেয়ে হারিয়ে যাচ্ছে।কিন্তু একজন সচেতন নাগরিক হিসেব তা মেনে নেওয়া যায় না।এটা ঠিক, সে কলেজে পড়ায়; উচ্চতর ক্লাস।কিন্তু তার মনে হয়,এই উচ্চতর ক্লাসগুলোর ছেলেমেয়েরাই তো এক সময় কচিকাঁচা ছিল।যদি তাদের ছোটবেলাটা ভাল কাটে তাহলে বড় বেলাও ভালো হয়।শোভন, নিজের শৈশবের সাথে এই থিওরির মিল খুজে পায়।

সেই শৈশব নিয়ে শোভন একটি-দুটি কবিতাও লিখেছিলঃ

'এখনও কলাবনের গন্ধ নাকে আসে,

 গাংঙের ঘোলাটে জলে হারিয়ে ফেলি নিজেকে;

স্মৃতিকাতর স্নায়ু আমার –

নাড়ার ফাঁকে ফাঁকে গতরাতে ফেলে আসা

বড়শি তুলতে -

উঠে পড়ি খুব ভোরে ।

ধানফুলের মাতাল হাওয়া

আমাকে শুইয়ে রাখতে রাখতে চায়;

শ্রান্ত কাকের মত

একমাথা রোদ্দুর নিয়ে ফিরি ঘরে ।

সদ্য কেনা পায়রা দুটি ফেরে নি বলে -

আলো ফেলেছি ঘুমন্ত গাছের মগডালে

তনুদের বাড়ি গিয়েছি কতবার !

রাত্রির কূল ঘেঁষে হৃদয়ের গভীরে

কি এক অজানা ভয় তাড়িয়ে বেড়াতো শুধু।

তবুও আজ সেই সব দিন মনে পড়ে

বিষন্নতার নির্বাক ব্যাপ্তির ভিতরেও ।'

তারপরে আরেকটি মনে পড়ে কিছুটা–

‘বাবুলাল,এখনো কি বনের ওধারে

সূর্য ধরতে যাস কি তোরা?

বাঘমারি জঙ্গলে টিয়ে ছানার জন্যে

সারাটি দিন কেটে যায় তোদের?

বাবুলাল,মিহির কি এখনো

ধাউস ঘুড়িতে আকাশ কাপায়?

নীরার মা রাত দুপুরে ধান ভানে?

রঙ্গিলা দি,বিলের জলে শাপলা তোলে?

..........’এভাবেই স্মৃতির দুয়ারে মাঝে মাঝে গিয়ে দাড়ায় শোভন।হয়তো কোনো মনিমুক্ত নেই।কিন্তু যেন একটা সুভাস আছে।ঘ্রাণ নিতে ইচ্ছে হয় সারাক্ষণ।তবে ইদানীং কবিতা লেখা হচ্ছে না শোভনের। মাঝে মাঝে দুই একটা লিখে ফেসবুকে পোস্ট করে।কিন্তু এখন ফেসবুকে লেখাতেও বেশি একটা আগ্রহী নয় সে।তাই নিজের ভিতরে ডুব দিয়ে কিছু করতে চায়;স্থায়ী কিছু।যা এই নিরেট আবহমান পৃথিবীর সামান্য হলেও পরিবর্তন ঘটাবে।আর সেই চেষ্টা থেকেই কিছু একটা করার উত্তেজনা ভিতরে ভিতরে।হয়তো সেই জন্যই আজকে শোভন যেখানে আছে সেখানে এনে ফেলতে পেরেছে সে।যদিও এর জন্য তার কোনো গর্ব নেই।সে নিজেকে আগের মতোই দেখে থাকে।

এখন অবশ্য একটা ব্যাপারে ও বুঝেছে,পৃথিবীতে সত্যিকার অর্থে মানুষের জীবনের কোনো উদ্দেশ্য নেই;অন্যান্য জীবনেরও।পৃথিবীর নিজেস্ব বৈশিষ্ট্যই পৃথিবীতে জীবনের উদ্ভবের কারণ। আর সেই জীবের ধীরে ধীরে বিবর্তনের ধারায় মানুষের উৎপত্তি।এমন নয় যে,হঠাৎ করে মানুষ এসেছে।তাই যেহেতু কোনো ঈশ্বরের সর্বক্ষমতাই শোভন বিশ্বাসী নয়, আত্নার অস্তিত্বের কল্পনাও তার কাছে অবান্তর। আর মৃত্যু তার কাছে স্বাভাবিক কিছু।তবে এই মৃত্যু নিয়ে ভাবাতেই যেন শোভন আয়নার মতো নিজেকে দেখতে পায়।ভাবে, আজ যারা এই পৃথিবীতে নবাগত, ঠিক একশ বছর পরে তারাও হারিয়ে যাবে।অর্থাৎ এই যে, এত সুন্দর চারপাশ,পাখির কলতান, মৃদু হাওয়া গায়ে এসে লাগে সে প্রাণ ভরে উপভোগ করে;একদিন সব ফেলে রেখে চলে যেতে হবে।ট্রেনে চলতে চলতে মাঠের দিকে তাকিয়ে, সবুজ ক্ষেতের সৌন্দর্য নেয়।শহরে উনুন ধরাবার সেই গুল পোড়া ঘ্রাণও সে ভালোবাসে।তবে জীবনকে মুত্যুর মুখোমুখি দাড় করিয়ে শোভন পেয়েছে এক বিশাল মানবিকতা। যেখানে কোনো আধ্যাত্মিকতা নেই,আছে বাস্তবতা-যদিও অনেকে এটাকে আধ্যাত্মিকতা ভেবে ভুল করে।মৃত্যুর সময় একটা সুন্দর হাসি নিয়ে সে মরতে চায়। সেই হাসি যেন, সে পৃথিবীর একটু হলেও কিছুটা পরিবর্তন করতে পেরেছে।কবি সুকান্তের একটি কবিতাকে তাকে দারুণভাবে টানে-

'এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য

করে যাবো আমি

নবজাতকের কাছে

এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।

যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ

প্রাণপণে এ পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল।'

কিংবা কামিনী রায়ের একটি কবিতাঃ

'আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে

আসে নি কেহ অবণী পরে

সকলের তরে সকলে আমরা

প্রত্যেকে আমরা পরে তরে।'

শোভন এই সব কবিতায় নিজের জীবনের মানে খুজে পায়।সেই জন্য বারবার পড়ে।ইউটিউবে আবৃত্তি শোনে।

অনেক ভাবনার মাঝে ডুবে যায় কখনো কখনো।এখন সে ভাবে কোন ক্লাস থেকে ভিডিও ক্লাস তৈরি করবে। একেবারে প্রি-প্রাইমারি থেকে?নাকি ক্লাস ফাইভ-সিক্স থেকে?

একবার ভাবছে ফাইভ সিক্স আরেক বার ভাবছে গোড়া থেকেই শুরু হোক।

এই সব ব্যাপারে ভারি খুতখুতে সে।সারাক্ষণ গোড়ায় যাবার চিন্তা তার।সে পড়তে গিয়েও তাই।বাংলার কত কিছু?কিভাবে এলো সেগুলো? তার ইতিহাস কি?

কলেজে পড়াকালীন একটা বড় সময় পার করেছে এই সব ভেবে।যদিও নেট তখন এতটা সহজলভ্য নয়।এখন তো একটা বিশাল বিপ্লব সাধিত হয়ে গেছে।এক সময় যে ইংরেজ আমাদের ইংরেজি শেখাবে কি না তা নিয়ে কত বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে।সেই ইংরেজের সব জ্ঞান বিজ্ঞান এখন বিশ্বের কাছে উন্মুক্ত। শুধু সন্ধানী দৃষ্টি চাই।আর শোভনও এটা চায়,ছেলে মেয়েদেরকে সন্ধানী দৃষ্টি একবার তৈরি করে দিতে পারলে তাকে নিয়ে আর চিন্তা থাকে না।জানার জন্য অফুরন্ত জ্ঞানের ভান্ডার তার সামনে খুলে রাখা হয়েছে। তবে

এই কাজটি দক্ষ ভাবে তাকে করতে হবে।চারিদিকে শিক্ষার দুর্দশা দারুণ ভাবে পরিলক্ষিত।এই ঘুণে ধরা সমাজে নতুন কিছু করাটাও বেশ কঠিন।তবে তাতে একটা আনন্দ আছে।

শোভন wbse এর ওয়েবসাইট থেকে একে একে ল্যাপটপে ডাউনলোড করে নেয় প্রি-প্রাইমারি থেকে টেন অব্দি বইগুলো।বইগুলোর নির্মাণ সত্যি অসাধারণ। ওর বইগুলো খুব ভালো লাগে।ওর মনে হয়,যদি কোনো মা বাবা সামান্য একটু পড়ার জ্ঞান থাকে সেই মা-বাবাও বইগুলো ধরে পড়ে পড়ে বোঝাতে পারবে ছেলেমেয়েদের।তবে ইংরেজি আর অংকের ক্ষেত্রে অনেক মা বাবারই সমস্যা হয়। এটাও তো সেই অজ্ঞতা চক্রের খেলা।তবুও শোভনের মনে আরেকটা ইচ্ছে আছে— মা -বাবাদেরকে সন্তান পালনের জন্য শিক্ষা দেওয়ার জন্য।হাস মুরগী, পশু পালন কিংবা কৃষিকাজের যেমন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আছে।তবে অন্য ক্ষেত্রে যতটা বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করা হয়,মানুষ পালনের ক্ষেত্রে ততটা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রয়োগ করা হয় না।এ বড় বিস্ময় শোভনের কাছে।অনেকে বলবে,কেন হয় না,হয়তো?শিক্ষকেরা তো ট্রেনিং নিয়ে পড়ান।তবে পশু পালন পালনে যেন ওদের স্বাস্থ্য তথা উৎপাদনের দিকে তাকানো যায় বা গাছপালা পালনে ফল দেখে বোঝা যায়—মানুষ পালনে সেটা হয় না।মানুষের স্বাস্থ্যের পাশাপাশি তার মনকেও পালন করতে হয়।এবং আমাদের শিক্ষায় এটাই করা হয়।কিন্তু মনের স্বাস্থ্যের খবর রাখেন কতজন?বা মনের রোগ হলে তা, বুঝতেই বা পারে কতজন?

শোভন প্রি প্রাইমারির বই ধরেই শুরু করে ভিডিও ক্লাস।তবে যথেষ্ট ভাবা-ভাবি করেই এগোচ্ছে।বইটি ভাল করে পড়ে নেয়।তারপর সেটা নিয়ে ভাবে, কিভাবে শিশুদের বোধগম্য এবং আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করা যায়।এক সপ্তাহের মধ্যেই ভিডিও গুলো রেডি করে ফেলে।বার বার দেখে।এক্ষেত্রে Khan Academy কে শোভনের মডেল মনে হয়।কেননা,শিশুদের থেকে শুরু করে উচ্চতর পর্যায় পর্যন্ত খান একাডেমির কার্যক্রম সে দেখেছে।সালমন খানের কন্ঠ তাকে উদবুদ্ধ করে।তাছাড়া,ওনার লেখা একটি বই ' A world Schoolhouse'তাকে অনুপ্রাণিত করেছে।বইটি কয়েকবার পড়েছে শোভন।কোনো বিশাল মহীরুহ যে ছোট্ট একটা বীজ থেকেই তার যাত্রা শুরু

করতে পারে, তা ওই বইটি পড়লে বোঝা যায় খুব দারুণ ভাবে।

আর একজন মানুষ শোভনকে দারুণভাবে উজ্জিবীত করে।তিনি হলেন অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সয়ীদ।ইউটিউব থেকে ওনার কথা শুনে শুনেই ওনাকে চেনা।কি এক অনন্য হাসিমুখের মানুষ।যিনি সদা তরুণ।তার একটা কথা আছে,"মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড়।"

তবে ক্লাসগুলো করার সময় কোনো ধরণের অনুকরণ সে করে নি।সম্পূর্ণ নিজের স্টাইলেই ক্লাস গুলো করতে চেয়েছে।প্রতিটি ক্লাসকে তিন চার মিনিটের বেশি দীর্ঘতর করা হয় নি।যাতে শিশুরা মনোযোগ না হারায়।তাছাড়া নানান এনিমেশন ব্যবহার করা হয়েছে।শোভন জানে,এখন অনেকেই এমন কাজ করছেন, সবার কাজই শোভনের ভালো লাগে।তাদের উদ্যোগকে সে কখনো প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতে অভ্যস্ত নয়।বরং তাদেরকে সে সহযোদ্ধা হিসেবেই দেখে থাকে।

৬

কলেজে ছাত্রছাত্রীদেরকে পড়ানোর জন্যও অনেক পড়তে হয়।কলেজ লাইব্রেরিতে অনেকটাই সময় কাটায়।লাইব্রেরীতে ছাত্রছাত্রীদের একেবারে আনাগোনা নেই।এর অবশ্য অনেক কারণই সে খুঁজে পায়,প্রথমতো লাইব্রেরিতে বসে পড়বার সংস্কৃতি এখানে নেই।লাইব্রেরী হচ্ছে একটা কলেজের হৃৎপিণ্ড। কিন্তু সেটাই যদি ধুকতে থাকে তবে জ্ঞানের প্রবাহ যে বাধাপ্রাপ্ত হবে তা তো নিশ্চিত। আর এ ব্যাপারে কারো কোনো উদ্বিগ্নতা নেই–তা দেখে শোভনের আরো খারাপ লাগে। কেউ যদি পুরাতনে ;চলে আসা প্রথায় উদ্বিগ্নতা বোধ না করে তাহলে কিভাবে তাকে নতুন করবার, অন্যভাবে সাজিয়ে তুলবার স্বপ্ন দেখবে?

অপর্ণার সাথে এ নিয়ে বহুবার কথা হয়েছে।তার উদ্বিগ্নতা লক্ষ্য করেছে অনেকবার।এই যে এই ভিডিও ক্লাসগুলোর ব্যাপারে সারাক্ষণ শোভনকে সাহায্য করেছে সে।

ধীরে ধীরে ওর ব্যাপারে কত কিছু জেনেছে—

যাদবপুরে পড়ার সময়ে প্রেম হয় ওদের। পরিবারের খানিকটা অমতেই অরিন্দমকে বিয়ে করে সংসার পাতে ওরা।অরিন্দমকে সত্যিই খুব ভালোবাসত অপর্ণা।এখন একটা ঘৃণা নেমে এসেছে ওর উপরে।

তখন অরিন্দম বেকার।সংসার চলে না,অপর্ণাও তখন কিছু করে না।টিউশনি করে চলতো ওদের।অরিন্দমের পরিবারও প্রথম প্রথম মেনে নেয় নি ওদেরকে। অনেক কষ্ট করে ভালোবাসার ঘর বেধেছিল ওরা।তবে অরিন্দম মেধাবী ছিল।তাছাড়া, একটা পত্রিকাতে ছবির এডিটিং কাজ করত সে।এক পর্যায়ে ব্যাংকে চাকরী হয়ে যায় ওর।অপর্ণা তখন থেকেই আর টিউশনি করত না।কিন্তু SET পরীক্ষা দেবার জন্যে পড়তে থাকে।মনে মনে কলেজের শিক্ষিকা হবার একটা ইচ্ছে ওর অনেককাল আগে থেকেই ছিল।এর আগে একবার দিয়েছে কিন্তু সংসারের নানান ঝামেলায় ঠিকমতো প্রস্তুতি ছিল না।এবার একটু মন দিতে চায়।অরিন্দম কেমন যেন নিজেকে পাল্টে ফেলে।সরাসরি না বললেও,বুঝিয়ে দেয়— এখন তার আর চাকরীর দরকার নেই।সে তো যথেষ্ট আয় করে।ইতিমধ্যে স্নেহার জন্ম হয়।স্নেহা ওদের মেয়ে।কিন্তু প্রতিবাদের ধারা ওর রক্তে।অরিন্দমের এমন আচারণ কেমন যেন ওর মনে একটা আঘাত দিলো।একদিন বলেই ফেললো,"আচ্ছা, অরি,তুমি কি চাও না, যে আমি চাকরী করি?"

—"আমি তোমাকে সে কথা বলি নি।স্নেহাকে মানুষ করবে না, তুমি চাকরী করবে?"

অরিন্দমের এমন কথায় কি জবাব দেবে অপর্ণা বুঝতে পারে না।যে অরিন্দম এক সময় বলতো,"অপর্ণা,নারী-পুরুষের আমি কোনো পার্থক্য দেখি না।শুধু বায়োলজিকালি যতটা তফাৎ।"

সেই অরিন্দমের মুখে এমন কথা শুনে নিজেকে ঠিক রাখতে পারে

না।বলে,"আমি তা পারব না।আমি চাকরী করে এবং মেয়েকে মানুষ করে দেখাবো —পারা যায় কি না।"

অপর্ণার ইচ্ছে হচ্ছিল তখনই মেয়েকে নিয়ে বেরিয়ে যায়।মেয়েটা তখন পিটপিট করে তাকাচ্ছিল।ওর দিকে তাকাতেই অপর্ণার কেন জানি না, চোখ বেয়ে জল চলে এলো।চিৎকার করে কান্না করতে চাইল।কিন্তু বুকের গভীরে সেই দুঃখকে চেপে রেখে একদিন ঠিকই মেয়েকে নিয়ে বাপের বাড়ী চলে এলো সে।

তবে অপর্ণা যে এটা ঠিক করে নি,,তা বুঝিয়ে দিলো সবাই।দাদা-বৌদি,মা বাবা সবাই যেন বিপক্ষে চলে গেছে।এমন অপরাধ যেন কেউ কোনোকালে করে নি।কিন্তু সে জানে এই পরিস্থিতি ঠিকই বদলে যাবে।তাই ধৈর্য ধরে পরীক্ষা দিলো সে। এবার নিশ্চিত হয়ে যাবে।হয়েও গেলো।

তারপর থেকে আর অপর্ণা কাউকেই তোয়াক্কা করে নি।এক মাসি কে এনে রেখেছে নিজের কাছে। কল্যাণীতে একটা ফ্লাটে থাক।মেয়েটাকে স্কুলে দিয়ে আসে নিয়ে আসে সে।অরিন্দম মাঝে মাঝে ফোন করে। কিন্তু অপর্ণা চায় না,মেয়ে তার বাবার পরিচয়ে বড় হোক।আর সেই ভাবেই বড় হচ্ছে সে।এটা ঠিক যে মেয়েকে সময় দিতে না পারার জন্যে অনেক খারাপ লাগে।কিন্তু সে এখন স্বাধীন।কোনোদিন তো অন্যের কথা মতো আর চলতে হবে না তাকে।

একদিন খুব আশা নিয়ে অরিন্দমকে ভালোবেসেছিল সে।কত স্বপ্নের জাল বুনতো মনে মনে।মা মাঝে মাঝে ফোন করে," অপর্ণা,এখন সব কিছু ঠিকঠাক করে নে মা।আর কতদিন এভাবে থাকবি?"

মায়ের এমন কথা শুনলে অপর্ণা আর স্থির থাকতে পারে না। বলেই দিয়েছে একদিন,"মা, প্রতিদিন তুমি আমাকে এই কথা অন্তত আর বলবে না।আমার সংসার করার কোনো ইচ্ছে নেই।আমি খুব ভালো আছি।আমি আবার ঝামেলাতে জড়াতে চাই না।"

মা চুপ করে যায়।পরে অপর্ণা বোঝে—মায়ের মন তো।ভাবে মেয়েটার বুঝি, জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেলো।আসলে আমাদের সমাজ যে এরকমই।একটা মেয়ের বিয়ে দিয়েই যেন তার জীবনের স্বার্থকতা খুঁজে ফেরে সবাই।কিন্তু

বিয়েটা যে চিরস্থায়ী একটা বন্দীত্বের নাম তা তারা আমলে নেন না।অপর্ণা তো এখন ডিভোর্স করার কথা ভাবছে।এভাবে আর টিকিয়ে রাখা যায় না।যে ঘুড়ির সুতো কেটে গেছে, লাটাই ধরে সে ঘুড়ি ফিরে পাবার আশা করাটার কোনো অর্থ নেই আদৌ। আর অপর্ণা তা করতেও রাজি নয়।

অপর্ণাকে শোভন প্রথম প্রথম যেমন ভাবতো এখন আর যেন তেমন করে ভাবতে পারে না।ভালো লাগাটা আগের মতোই আছে।কিন্তু অপর্ণার ব্যাপারে একটা শ্রদ্ধাবোধ যেন ওর মনের দেওয়াল জুড়ে আল্পনা এঁকে গেছে।এখন অপর্ণাকে তার খুবই কাছের বলে মনে হয়।

ভিডিও ক্লাসগুলো প্রতিটাই দেখেছে সে।স্নেহা এখন দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়লেও ওকে দেখিয়েছে।সেও খুব মজা পেয়েছে।

বিশেষত শিশুরা যা ভালোবাসে, সেই ভাবেই সেগুলো তৈরী হয়েছে। সেই কয়দিন ওর যথেষ্ট পরিশ্রম হয়েছে।অপর্না তো আবার বলতে শুরু করেছে,"শোভন,অন্য ক্লাসগুলোর ভিডিও শুরু করতে হবে তো।এটাও একটা বিপ্লব মনে রেখো।"

—"হ্যা, তোমার প্রেরণা আমাকে এত দূর এনেছে।সেই নজরুলের কবিতা মনে পড়ে যাচ্ছে—

"কোনো কালে একা হয়নিকো জয়ী

পুরুষের তরবারী

প্রেরণা দিয়েছে,শক্তি দিয়েছে

বিজয়লক্ষ্মী নারী।"

শোভনের এই একটি স্বভাব আছে।মাঝে মাঝেই কথার মধ্যে কবিতা টেনে আনে।ওর মনে হয়,কবিতা তো মনের কথাই।তাই একটু কথার মধ্যে কবিতা আনলে তা তো বেশই হয়।

রবিবারের দুপুর।এখনো স্নান করে নি।ফোনটা বেজে উঠল,মান্না দের সেই দরদ ভরা কন্ঠের রিংটোনে।

"বধূ কি তীরে বসেই, মধুর হেসে

দেখবে শুধু সারাবেলা"

অপর্ণার ফোন।একটু আগেই whatsapp এ কথা হয়েছে অপর্ণা সাথে।স্নেহার সাথে খেলছিল তখন।হঠাৎ ধরেই শোভন বলে,"স্নেহা কোথায়?কি করছে?"

—" স্নান করে ঘুমিয়ে গেলো।মাসি আর আমি এখন খাবো।তুমি কি করছো?"

এভাবে শোভনকে কেউ কোনোদিন জিজ্ঞেস করে নি।কলেজে থাকতে অনেক বান্ধবী ছিল ওর।তবে তাদের সাথে কখনোই খোলামেলা হতে পারে নি।একটা দুরত্ব থাকতো সব সময় ।নূপুর নামের একটা মেয়েকে মনে পড়ে শোভনের।মেয়েটা মনে হতো শোভনকে মনে মনে পছন্দ করতো।কিন্তু সেও কোনোদিন বলে নি,আর শোভন সেইভাবে আগ্রহ দেখায় নি।কোথায় যেন একটা সংকোচ এসে পথ আগলে দাড়াতো।সবাই প্রেম করতো।সবার দেখাদেখি প্রেম করার একটা মোহ একটা বয়সে থাকলেও তখন ছিল না।বিরুদ্ধতা শোভনের বিশেষত্ব যেন।তবে কফিহাউজে সাহিত্যের আড্ডায় বন্ধুদের সেই সঙ্গটা ওর মনকে একেবারে তরতাজা করে তুলেছিল।

"আমিও স্নান করবো করবো ভাবছি।আবার কালকে কলেজে আমার ক্লাস আছে। একটু পড়তে হবে।তা পড়াই হচ্ছে না।কিভাবে কি করবো বুঝতে পারছি না।"

ওপার থেকে অপর্ণাকে যেন মনে হল খুব হালকা মেজাজে আছে ।কল্পনায় দেখার চেষ্টা করল ওকে, ভেজা চুলে বসে আছে খাবার টেবিলে।সেই শুভ্র মুখে সকালের সূর্যের চিকচিকে হাসিখানি ঝরছে।

"তুমি এক কাজ করো।ওই ক্লাসগুলো শেষ করো।স্নেহারও অনেক কাজ দেবে।"

—"তা তো করবো।কিন্তু কেমন যেন এক ঘেয়েমি চলে এসছে। কি করবো, বুঝতে পারছি না?"

"ভাত খাও।" বলে হেসে উঠে অপর্ণা।

--"খাবো। কি রান্না করেছো?"এখন শোভন অপর্ণা দি বলে না।কোনো সম্বোধন ছাড়াই কথা বলে।অপর্ণাও আগে বেশ ওকে নাম ধরে ডাকতো।এখন ডাকে না।বিষয়টা নিয়ে ভাবতে চায়।অস্পষ্ট কোনো সমীকরণ সৃষ্টির আভাস পায়।যেমন হালকা হালকা বাষ্পগুলো নীল আকাশ জুড়ে সাদা পেজা তুলোর মেঘ আনে, তেমনি এই ছোট ছোট কথাগুলো ওর মনেও হয়তো কোনো জলজ আবেশ তৈরি করেছে।

অনেকক্ষণ হয়ে গেলো অপর্ণা ফোন কেটে দিয়েছে।কিন্তু ওর সেই কন্ঠ যেনো শোভনের কানে বেজে চলেছে।অপর্ণাকে নিয়ে আরো যেন ভাবতে চায় সে।ওকে নিয়ে হারিয়ে যেতে চায়।আর কল্পনার এই সুবিশাল তটে হারিয়ে যাবার তো মানা নেই।কেননা কোনো রাষ্ট্রযন্ত্র তো এখানে কাটাতার নিয়ে বসে নেই।এখানে আছে,ফেনা মাখা জলের শিতল হাওয়া আর সুদূর দিগন্তের এক স্বপ্নময় হাতছানী।

৭

সামনে পূজা।ইতিমধ্যে দোকানে দোকানে ভিড় জমা শুরু হয়েছে।তবে গরম কাটে নি।আষাঢ় মাস বর্ষার হলেও এবার ঝরঝর ঝরে নি ।শ্রাবণ মাসের শেষের দিকে একটু হয়েছে।ঋতুগুলোও কেমন বদলে ফেলছে তাদেরকে।

আগে শরৎ এলে কত খবর থাকতো তাতে।এখনো থাকে হয়তো।কিন্তু হতেও পারে শোভন তা পায় না। আসলে গ্রামের মাটির নরম টুকরো এখন যেন শহুরে ইট হয়ে গেছে।নিজেকে গ্রামের নির্সগতায় সপে দিতে ইচ্ছে হয়।কিন্তু পারে কোথায়।কত কর্তব্যের বেড়াজালে, নিয়মের তৎপরতায় জীবন বয়ে চলে। কত জটিলতার ধাঁধায় ভরে গেছে জীবন। যেন বেরোবার ফাঁকফোকর নেই।

কী আছে জীবনে—ওই যে ওর গাঁয়ের মানুষগুলো।ওদের কয়টা ঘর বাদ দিলে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সবাই।আধুনিক শহরের জীবন ওদের না।ওরা তা চায়ও না।বেঁচে তো ওরাও আছে।এত জটিল নয় ওদের যাপন।বেঁচে থাকাটাই যেন ওদের আরাধনা,খেতে পারাটাই ওদের স্বার্থকতা। তবে দুঃখ আছে অনেক।অভাব আছে খাদ্যের।অনাহার আছে।

এবার পূজোয় ওদের ওখানে গিয়ে কিছু একটা করবে ভাবছে। প্রাইমারি বিদ্যালয় আছে একটা কিন্তু তাও চলছে ধুকধুকিয়ে।কোনো নজরদারি নেই।আর এখানে খবর নিতে আসারই বা কে আছে? তবে এদেরকে শিক্ষিত করতে পারলে,বোঝাতে পারলে —তারাও এই বৃহত্তর ভারতের কেউ, হয়তো অন্য রকম হবে আগামীর সমাজ।

সরকার যতই তৎপরতা চালাক।দরদী মন ছাড়া এই অশিক্ষার অরণ্যে কেউ আলো হাতে চলতে পারবে না।নিছক দায়িত্বপালন নয়,অনেক স্বপ্নের দরকার এই সব জনপদে।তবে খুব যে কঠিন সে পথ ;তা শোভন নিজেও জানে।

কলেজ চলছে পুরোদমে।ছুটি নেই তেমন।সামনে বড় ছুটি।সবাই যেন সেই দিকে তাকিয়ে আছে।অনার্সের স্টুডেন্টস ছাড়া পাস কোর্সের ছাত্রছাত্রীদের কলেজে উপস্থিতি তেমন নেই। তাদের অনেকেই চাকরীর প্রস্তুতি নিতে থকে এই সময়ে।অনেকের কোনো দিশা থাকে না।

ছাত্রছাত্রীদের সাথে বেশ মিশে গেছে এই কয়দিনে। ওদের নিয়ে কলেজে একটা উদ্যোগ শুরুর কথা ভাবছে—

‘গণতান্ত্রিক ক্লাসরুম’। নামটি অপর্ণার দেওয়া।অনেকদিন আগে থেকেই বিষয়টি মাথার মধ্যে ঘুরছিল শোভনের।অপর্ণার সাথে এতোদিন আলাপ

করে, একটা ছোট্ট পুস্তিকাও লিখেছে দুজন।

বইটির ভূমিকাতে লিখেছে-

" মানব সমাজে ' গনতন্ত্র ' এক বিশাল প্রাপ্তির নাম।আমরা এখন চেতনে-অবচেতনে এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মিশে গেছি।কিন্তু সমস্যা হল, এই চেতনা আমাদের মাঝে ঠিকভাবে বিকশিত হয় নি।প্রশ্ন উঠতে পারে, গণতান্ত্রিক চেতনা বিকাশের প্রয়োজনীয়তাই বা কী—একটা অংকের সমস্যা যেমন না বুঝলে অংকের সমাধান মেলানো অসম্ভব।তেমনই গণতন্ত্রকে না বুঝে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা পরিচালনাও সুদূর পরাহত। অথচ আমাদের সমাজে দিব্যি গোজামিলের সংস্কৃতি বহমান।এটা অনেকেই ধরতে পারছে না।ফলে এক ভুলে লের সাম্রাজ্যে আমাদের চলাচল।হয়তো চতুর্দিকে রাজনৈতিক এত হিংসাও সেই জন্যে।আমরা মনে করি,আমাদের প্রজন্মকে এই 'গণতান্ত্রিক' চেতনায় দীপ্ত করে তোলা আমাদের সকলেরই কর্তব্য।এটা সবাইকে মনে রাখা দরকার, রাজনীতি করা আর রাজনৈতিক চেতনা এক কথা নয়।আমরা কোনো রাজনৈতিক দল নই।ভিন্নমতবাদও আমাদের নেই।রাজনৈতিক দল গুলোর মূল ভিত্তি যে 'গণতন্ত্র' —আমরা তাকেই বিকশিত করছে চাইছি আমাদের প্রজন্মের চেতনায়।

প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, সুধী অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণকে আমাদের এই আলোর যাত্রায় সামিল হবার জন্যে বিনীত অনুরোধ করছি।"

পুস্তিকাটি ছাপিয়েও এনেছে হাজার কপি।অপর্ণাই শুধু জানে।কিন্তু কিভাবে এখন এগোবে সে বুঝে পায় না।কখনো কখনো মনে হয়,হয়তো কোনো ছেলেমানুষী করছে তারা।সবার হাসির পাত্র হবে।একটা ভয়ও কাজ করে।একজন শিক্ষক হিসেবে ক্লাসরুমই তার জায়গা। রাজনীতি করাটা বোধহয় তার ঠিক হচ্ছে না।কিন্তু এটা তো তার ভিতরে যে একটা অন্য মন আছে তার কথা।সেই মনটা তো অন্যের।আর ওর নিজের মনটা তো এ না।ওর মন অন্য রকম।অপর্ণার মনের কাছাকাছি।

একবার ভাবে পূজোর পরে শুরু করবে। কিন্তু সেটাও দেরি হয়ে যাবে অনেক।তাই ভাবনা শুরু করে।কিভাবে কাজটি করবে।শোভনের মূল ভয়—

অন্যান্য শিক্ষকদের অংশগ্রহণে অনীহা।সে জানে বেশিরভাগ শিক্ষকই এটাকে রাজনীতির ব্যাপার-স্যাপার মনে করে এড়িয়ে যেতে চাইবে।এড়িয়ে যাবেও।কিংবা সরাসরি এর বিরোধিতাও করতে পারে।

শোভন জানে বীরভোগ্যা এ বসুন্ধরা। ভীরুরা চিরদিন ভয় পেয়ে পেয়ে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে।অনেক নিয়েছেও—সে ইতিহাস ওর জানা।তাই আর পিছপা হবে না।কিন্তু একটা পরিকল্পনা করতে চায় সে।কীভাবে হবে তার কার্যক্রমের সম্পাদন।

প্রিন্সিপাল স্যার ব্যস্ত মানুষ। সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকেন।তবে শোভন এর মধ্যে কয়েকবার ওনার সাথে কথা বলেছেন।সত্যি একজন অমায়িক মানুষ তিনি।যদিও শোভন কি করতে চায় —সে ব্যাপারে এখনো স্যারকে কিছুই জানায় নি।কিন্তু কিভাবে বলবে তা? অপর্ণার সাথে যদিও পরিচয় আছে।কিন্তু অপর্ণাও চাইছে,প্রিন্সিপালকে শোভনই আগে বলুক।

একদিন সাহস করে ঢুকে পড়ে স্যারের কক্ষে।

"বলো,শোভন,কেমন আছো?কেমন লাগছে কলেজের এই জীবন?"এমন প্রশ্ন যে করতে পারে তার মনটি কেমন উদার হতে পারে তা বুঝতে বাকী থাকার কথা নয়।তবে স্যারের সামনে কেমন যেনো একটু সংকোচিত সে।ভয় যে কাজ করছে তা নয়।

বলে," স্যার,ভালো যাচ্ছে।স্যার,আমি পাঁচ মিনিট একটু আপনার সাথে কথা বলতে চাই।সেই জন্যেই এলাম।"

"আরে বলো বলো।এই সব প্রশাসনিক কাজের বাইরে আমি একজন শিক্ষকই তো।সত্যি বলতে কি,মাঝে মাঝে ভাবি একটা দুটো ক্লাস নিই। কিন্তু পেরে উঠি কোথায়?"মনে হল কীভাবে যে স্যার বুঝতে পারছেন নিশ্চয় শোভন কোনো ভালো প্রস্তাব নিয়ে এসেছে। সে ও তো এই রকম একটা সময় পার করে এসছে।

"স্যার,আপনার কথায় সাহস পাই।আপনি এতো ব্যস্ত থাকেন—"

—"ব্যস্ত তো থাকতে হয়;তুমি বোধহয় জানো না একটু লেখালেখির অভ্যেস ছিল, সেটাও এখন সিকেই উঠেছে।"

"আসলে আপনার এটি খুব বড় দায়িত্ব।এত দিক সামলাতে হয়?"

" এত সামলেও স্বস্তি নেই রে।তুমি তো দেখছো এক বছর কলেজের অবস্থা—কত কিছুর মধ্য দিয়ে যাচ্ছে কলেজ?"

প্রকৃত শিক্ষিত মানুষ বোধহয় এমনই হয়।হাজার ব্যস্ততায়ও যার স্বপ্ন থাকে সুন্দরের,ইচ্ছে থাকে কিছু নির্মাণের।

"স্যার,কলেজ নিয়েই ভাবছি।একটা ব্যপার মাথায় আসছে।সেটাই জানাতে এলাম আপনাকে।"

প্রিন্সিপাল স্যার যথেষ্ট আবেগী মানুষ।এর আগে কলেজ অডিটোরিয়ামে ওনার বক্তব্য শুনেছে শোভন।আগাগোড়া সংস্কৃতিমনা মানুষ।এখন কথা বলতে বলতে শোভনের মনে হচ্ছে মানুষটা স্বপ্নবাজও।

"শোভন,তোমার মতো বয়সে আমিও যে স্বপ্ন দেখতাম—সব কিছু পাল্টে ফেলবার নেশা চেপে গিয়েছিল।সেই নেশা থেকেই তো এতদূর। কিন্তু কিই বা করতে পারলাম—"

একটা হতাশার দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।ইতিমধ্যে পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে।শোভনের মনে থাকলেও স্যারের মনে নেই।

"স্যার আমার মনে হয়,বাইরের রাজনীতির উত্তাপ আমাদের কলেজে এসে লাগছে।এটা নিয়েই আমার ভাবনা।অপর্ণা দি আর আমি একটা ব্যাপার ভেবেছি।ভেবেছি,আমরা যদি আমাদের ছেলে মেয়েদের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ ঘটাতে পারি নিশ্চয়ই আমাদের অবস্থা পাল্টাবে।"

স্যার কেমন যেন স্থির হয়ে গেলেন। চোখগুলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভাববার চেষ্টা করলেন—আসলে ব্যাপারটা কেমন হবে।

"শোভন,গনতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ ব্যাপারটা কেমন হবে?" প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে তিনিও ভাবতে বসে গেলেন।চিন্তাশীল মানুষের এটাই বৈশিষ্ট্য। অন্যের উত্তরের সাথে সাথে নিজেও ভাবতে থাকেন।

"স্যার,এটা অন্যান্য সাবজেক্টের মতোও একটা কার্যক্রম। যেটা আমাদের কলেজই পরিচালনা করবে ক্রিয়েটিভ কাজ হিসেবে।এখানে রাজনীতির দলগিরি নেই, আছে রাজনৈতিক চেতনায় আমাদের প্রজন্মকে উজ্জীবিত করা।"

প্রিন্সিপাল স্যার যেন আরো বেশিটা বুঝে নিলেন।এটা যেন স্যারের কাছে একটা সোনার হরিণ।

"শোভন,এতোদিন তো আমি এমন কিছুই যেন চাইছিলাম–সত্যি কথা কি জানো শোভন,আমাদের সব কিছুতেই শিক্ষার দরকার আছে।আপনা আপনি যা শেখা হয়, তা হয়তো বাস্তব কিন্তু তা থাকে ভুলে ভরা।প্রতিটি বাস্তব মানে তো আর সত্য কিছুর দ্বারা সম্পাদিত নয়,মিথ্যাও তো থাকতে পারে।"

স্যারের কথাগুলো সে উপলব্ধির চেষ্টা করে।সে জানে,কলেজ নামক একটি প্রতিষ্ঠানে প্রতিটি শিক্ষকদেরই তাদের নিজেস্বতা নিয়ে চলে।প্রত্যেকেরই ভাবনার ভুবন আছে।সে ভুবনে পৌছানো চাই।আসলে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ই তো ভাবনার বিকাশের জায়গা,চেতনা বিকাশের পীঠস্থান।

"স্যার, আপনার কথার এতো গভীরতা যেনো ভাবতেই মনে ভালো লাগা শুরু হয়ে গেছে।"

এর মধ্যে সেই পুস্তিকাটা পকেট থেকে বের করে প্রিন্সিপাল স্যারের কাছে দেয়।

"স্যার,অপর্ণা আর আমি এইটা তৈরি করেছি। কিভাবে আমাদের কাজটা করবো।"

"অপর্ণা মেয়েটাও খুব মেধাবী।ওর ভিতরেও কিছু একটা করার নেশা আছে।আসলে এই নেশা সবার থাকে না রে—এটাও বোধহয় শিখতে হয়।"

বলে হেসে ওঠে প্রিন্সিপাল স্যার।

"অপর্ণাকেও একটু ডাকো।ও কি এখন ফ্রি আছে?"

অপর্ণা জানে শোভন প্রিন্সিপাল স্যারের রুমে গিয়েছে।অনেকক্ষণ হলই গিয়েছে।এতক্ষণ ধরে সে কি করছে?হয়তো স্যারই আমাদের স্বপ্নে বিভোর হয়ে গেছে।মনে মনে ভাবে সে।

হঠাৎই বেজে ওঠে ফোনটা।

"অপর্ণা, প্রিন্সিপাল স্যারের রুমে একটু আসো তো।স্যার ডাকছেন।"

—"হ্যা , আসছি।"

অপর্ণা এলে প্রিন্সিপাল স্যার ওকে জিজ্ঞেসা করে,"আচ্ছা, তোমরা কি করতে চাইছো, একটু বলো তো?শোভন তো বলল খানিকটা?"

"স্যার,সেদিন প্রায় সব ডিপার্টমেন্টে ক্লাস চলছে।হঠাৎ চিৎকার স্লোগান।কিসের?কোন দল কোথায় কোন নির্বাচনে জয়ী হয়েছে তাই!একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কি এটা কাম্য?কিন্তু এটা আমাদের দেখতে হচ্ছে।হয়তো আপনিও জানেন,এই যারা এদের একটাও পড়ালেখা করে না ঠিকঠাক। আমাদের মতো অনেক কলেজের অবস্থা এই।কিছু একটা করতে চাইলেও হচ্ছিল না।শোভন আসাতে একটু সাহস হল।"

প্রিন্সিপাল স্যারের সামনে শোভন প্রথম দিকে এতোটা খোলামেলা হতে পারে নি যতটা অপর্ণা হল।তাছাড়া প্রিন্সিপাল স্যারও ওর সাথে যথেষ্ট মেশেন।তিনি ও তো বাংলা ডিপার্টমেন্টের। তাই মাঝে মাঝেও নিজের ডিপার্টমেন্টের একটু খোঁজ-খবর নিবেন এ আর নতুন কি?

ইতিমধ্যে ওদের কথা শুনবার ফাঁকে ফাঁকে পুস্তিকাটার কয়েকটা পাতা উল্টে দেখবার চেষ্টা করেন তিনি।ওটা হাতে ধরে বলে,"এটা আমি পড়ি আগে।আমাকে একবার আগামী কাল রাতের দিকে ফোন করো তোমরা।আসলে ব্যস্ত থাকতে হয় তো।আর ম্যানেজিং কমিটির মিটিং এ বিষয়টা তুলতে হবে।সামনে একটা মিটিং আছে।তারপর জানাবো।"

তারপর আর কিছু কথা বলে ওরা বেরিয়ে আসে।একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারল না।কেননা মিটিং ব্যাপারটা চিরদিনই গোলমেলে। তবুও একটা ক্ষীণ আশার আলো তো দেখা যাচ্ছে।এটাই তাই কতো।অন্তত প্রিন্সিপাল স্যারের সাথে তো বিষয়টা শেয়ার করা গেল—এই ভেবে অন্তত একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা যেতেই পারে।

৮

তখন অনেক রাত। বিছানায় শুয়েও পড়েছে শোভন।ঘুম আসছে না।হঠাৎ খেয়াল হল,ব্যাপারটা যদি ম্যানেজিং কমিটির মিটিং এ স্যার উপস্থাপন করে তাহলে আবার ভেস্তে না যায় সব কিছু?তার চেয়ে অন্যভাবে এগোনোর একটা আইডিয়া মাথায় এলো।

নতুন একটা আইডিয়া মাথায় এলে শোভনের উত্তেজনার পারদ যেন আরো বেড়ে যায়।অপর্ণাকে এতো রাতে ফোন করতেও এখন আর দ্বিধা নেই।

পাশে থাকা ফোনটি তুলে কল করে ওকে। অপর্ণার কন্ঠস্বর,"কি হয়েছে?এখনো ঘুমোও নি।"

—"না, ঘুম আসছে না।অপর্ণা একটা ব্যাপার ভাবছি।বলতো কেমন হবে?তুমি ঘুমিয়ে গিয়েছিলে নাকি?"

"না, আমারো কেমন যেন ঘুম আসছে না।বলো, তোমার আইডিয়াটা—" যেন শুনবার জন্যে একটা অধীর আগ্রহ নিয়ে ওপার থেকে জবাব দেয় অপর্ণা।যতবারই শোভন ওকে ফোন করেছে কখনো বিরক্তি দেখে নি।মাঝে মাঝে অবাক লাগে শোভনের নিজেরই।

"আমার মনে হয়।ব্যাপারটা মিটিং এ গেলে অন্য রকম দাড়াবে।তার থেকে প্রিন্সিপাল স্যারকে বলে –প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টের কয়েকজন ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকদের নিয়ে একটা সভা করলে কেমন হয়?"

অপর্ণা একটু ধীরে কথা বলে।পাশে স্নেহা ঘুমোচ্ছে।বলে,"এটা নিয়ে আমিও ভেবেছি।–ম্যানেজিং কমিটির মিটিং এ অনেক ঝামেলা হতে পারে।তার চেয়ে প্রিন্সিপাল স্যারকে সঙ্গে নিয়ে প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টে গিয়ে গিয়ে আগে একটু কথা বলতে হবে।"

"হ্যাঁ, এটাই করা যাক।তাহলে কালকে প্রিন্সিপাল স্যারকে খুলে বলব ব্যাপারটা।আবার, তিনি রাজি হবেন তো?"একটা জিজ্ঞাসা থেকে যায় শোভনের।

"আগে বলে দেখি তো।সম্ভবত তিনিও সিচ্যুয়েশনটা বুঝবেন।"

–"হ্যাঁ, দেখা যাক তাহলে–"

"হ্যাঁ, তা কত রাত জাগবে?ঘুমাবে না?"অপর্ণা এবার একটু সহজ হয়।

" হ্যাঁ, ঘুমোবো।আসলে বিষয়টি মাথার থেকে যাচ্ছেই না।"

"পাগল একটা–" অপর্ণা একটা দরদ মেখে কথাগুলো বলে।যেনো তাতে গোলাপের সুগন্ধ ছড়িয়ে দেওয়া।বারবার তার ঘ্রাণ নিতে ইচ্ছে হয়।

ফোনটা রেখে দিতেই শোভনের সমগ্র সত্ত্বা জুড়ে অপর্ণার উপস্থিতি। এই রাত্রের ঝিঝি ডাকা ঘনিষ্টতায় অপর্ণা যেন আরো কাছের কেউ হয়ে উঠেছে।মাঝে মাঝে মনে হয় সেই সদ্য যৌবনে পা রাখার মূহুর্তে এক বন্ধুর কথা," শোভন যাকে মন থেকে ভালো লাগে, তাকে ব্যাপারটা বলেই দিবি।"

কতদিন হয়ে গেছে। বন্ধুটিও কোথায় হারিয়ে গেছে।কিন্তু তার সেই কথাটি এখনো কানে বাজে।কত আত্নবিশ্বাস ছিলো সেই কথায়।মাঝে মাঝে সে ও ভাবে,অপর্ণা কে বলে দিই।যা হবে তারপর। কিন্তু কোথায় যেন বেঁধে যায় আবার।এমন কতবার ভেবেছে আগে।কিন্তু কিছুই বলা হয় নি।তবে এই না বলা ভালোবাসাতেও একটা উদ্যম থাকে, একটা গভীরতা থাকে।

মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগে ওর," অপর্ণা কি তাকে নিয়ে একটুও ভাবে?"হিসেব মিলাতে পারে না।আবার এমনো হতে পারে অরিন্দমের জন্যে ওর মনের মহলে হয়তো কোনো একটি কোণ ফাঁকা রেখেছে এখনো।তবে তা সে জানে না,জানবার জন্যে অপর্ণাকে প্রশ্ন করলে, সে রেগে যায়।অরিন্দম সম্পর্কে কারো কাছে কিছু বলতে চায় না।এই না বলতে চাওয়াটাও যে, ওর কোন মনের প্রকাশ তা শোভন ভেবে পায় না। তবে অপর্ণা ওর মন জুড়ে থাকে।অপর্ণা জানুক আর না জানুক।

আজকে শোভনের মাথা ঝিমঝিম করছে না।অন্যদিন একটু রাত জাগতেই স্নায়ুগুলো যুদ্ধ ঘোষনা করে দেয়।অনেক দিন কবিতা লেখে না।

মোবাইলের নোটপ্যাডে লিখে ফেলে অপর্ণাকে নিয়ে একটা কবিতাঃ

"অনন্যা,

সেই কবে তুমি এঁকেছিলে-

উপত্যকার অন্ধকারে কোন এক যুবকের মুখ?

তোমার স্বাধীন অভিব্যক্তি

তোমাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে-

চলমান সাম্রাজ্যের বিপরীতে।

তোমার তুলি আজ

কঠিন সময়ের মুখোমুখি;

চেতনার ক্যানভাসে

মূর্তমান কিছু জিজ্ঞাসা-

বারবার তোমাকে নাড়া দিয়েছে।

তুমি চিনে নিতে চেয়োছো—

পৃথিবীর সব রঙ,

নতুন এক নির্ঘণ্ট সাজিয়েছো

বিমুক্ত স্মৃতি জুড়ে।

অনন্যা,

চেয়ে দ্যাখো ইতিহাসে-

বারংবার প্রতিধ্বনিত মনস্তত্ত্বের

বিশাল চিত্র;

হয় তো তোমার কল্পনায়

মহাকাব্যের জন্ম দিবে কোনো।

তোমার বিবর্তিত স্বপ্নের কুয়াশায়

গাঢ় হয়ে ওঠে সেই মুখ;

আধার দেখতে দেখতে

পেরিয়ে আসা রাতের গল্প

শোনাবে তো আজ?"

কবিতাটি লিখেই পাঠিয়ে দেয় অপর্ণাকে।বলে, "অপর্ণা,ঘুম আসছিল না।কেমন যেন তোমাকে খুব মনে পড়ছিল।অনেক দিন কবিতা থেকে দূরে

ছিলাম।হঠাৎ করে এটি লিখতে ইচ্ছে হল।"

কিন্তু সম্ভবত অনন্যা ঘুমিয়ে গেছে।শোভনের অপর্ণাকে অনন্যা বলেই মনে হয়।আসলে, মেয়েরা যে নিজেদের গন্ডি ছেড়ে চাইলে বের হতে পারে তা অপর্ণাকে দেখলেই বোঝা যায়।

তবে এখন শোভনের চোখও ঘুমের সংবাদ পেয়েছে।অনেক রাত হল যে! সকালে উঠতে উঠতে তবুও অনেক দেরি হয়ে যাবে।কিন্তু অপর্ণার কথা মনে পড়ছে।

রাতের দিকে একটা গান সে প্রায়ই শোনে:

"খোলা এলো চুল মুখের দুপাশে ছড়ায়ে

তুমি ঘুমায়ে আছো কি?

তুমি ঘুমায়ে আছো কি মোর দেওয়া সেই

ঝরা মালা বুকে জড়ায়ে?"

এখনো ওই গানটি চালিয়ে ঘুমিয়ে যায় সে।

৯

ভেবেছিল সভাটি কলেজ অডিটোরিয়ামে হবে।কিন্তু কিছুটা ভেবে-চিন্তেই সায়েন্স বিল্ডিংয়ের একটা বড় কক্ষেই হল।তবে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি তুলনামূলক কম ছিল। অধ্যাপক-অধ্যাপিকা গণ এসেছিল কেউ কেউ।

আসলে রাজনীতি বলি আর গণতন্ত্র বলি—এগুলো নিয়ে কাজ করা মানেই

অনেকের কাছে সমীচীন নয়।ফলে তাতে যোগ দিয়ে কি ছাত্র কি শিক্ষক সবাইই একটু অস্বস্তি বোধ করতে পারে।হয়তো সেই হেতু এমন অবস্থা।

এক সপ্তাহ আগে থেকেই ডিপার্টমেন্টে ডিপার্টমেন্টে গিয়ে জানানো হয়েছিল।ছাত্রছাত্রীদের সাথেও কথা বলা হয়েছিল।সবচেয়ে নির্লিপ্ততা দেখা গেছে সায়েন্সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে।ওদের কাছে আর্টসের ডিপার্টমেন্টের কোনো প্রোগ্রামের যেন গুরুত্বই নেই।অবশ্য এর অনেক কারণ আছে,তারা ভুলে যায় —রাষ্ট্রবিজ্ঞান নামে একটা সাবজেক্ট আছে।সেটাও বিজ্ঞান।বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই তার বিকাশ।কিন্তু এদের মস্তিষ্কে আগে যে কত কিছু কারা কীভাবে প্রোগ্রামড করে রেখেছে তা বোঝা মুশকিল।এরাই ভবিষ্যতে ভোট কাকে দেবে বুঝতে পারবে না?এক বার এ দলকে তো আরেকবার অন্যদলকে।আসলে এদের নিজেস্বতা তৈরি হবে না।এটা ঠিক অনেক বড় বড় ডিগ্রি নিয়ে অনেক উচ্চে যাবে —কিন্তু নিজেদের ভোটাধিকারের গুরুত্বটা কোনোদিন বুঝবে না।

প্রায় সব ডিপার্টমেন্টের অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা ছিলেন কম বেশি।শ্রেণি কক্ষ প্রায় নিশ্চুপ। আসলে এখানে যারা এসেছে তারা নিজের ইচ্ছেতেই এসেছেন।কেননা,এই সভায় যোগ দেবার ব্যাপারে কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না।তবে সবার কাছে এভাবে বলা হয়েছিল—"এটা আমাদের কলেজকে সুস্থ্য করার একটা অভিযান।আপনিও যোগ দিতে পারেন।"

এই কয়দিন সব ডিপার্টমেন্টের আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীরা মিলে গেছে।এটা যে পড়ালেখার বাইরের কোনো বিষয় না সেই বিষয়টা একেবারে শুরু থেকে সবার মনে গেথে দেবার লক্ষ্যে অপর্ণা শুরু করল। পিছনে তার একটা বড় ব্যানার, "গণতান্ত্রিক চেতনা বিকাশ অভিযানঃ গণতান্ত্রিক ক্লাসরুম "।

অবশ্য এর আগে ছাত্রছাত্রীরা গেয়েছে একটা রবীন্দ্রসংগীত—

" আরো আলো, আরো আলো

এই নয়নে প্রভূ ঢালো।"

" কলেজটা ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়েই এগিয়ে চলে। যে কলেজে ভর্তি হয়েছে সেইই কলেজের স্টুডেন্ট।এতে কোনো সন্দেহ নিশ্চয়ই থাকার কথা নয়।ছাত্র-ছাত্রীদের অনেক চাওয়া-পাওয়া থাকে কলেজের কাছ থেকে।একক ভাবে তা সম্ভব না হলেও, মিলিত কোনো সংগঠন সেই চাওয়া-পাওয়ার দাবী তুলতে পারে।এটা যে কোনো কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ঘাটলেও দেখা যেতে পারে।তাই বলতে পারি,ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থেই ছাত্রছাত্রীদের এমন সংগঠনের দরকার আছে।কিন্তু যখন এটা না হয়ে সেটা কোনো বাইরের দলের স্বার্থ দেখে এবং কলেজ প্রাঙ্গণে অরাজকতার পরিবেশ তৈরি হয় তখনই আমাদের প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়।ভাবতে হয়, এভাবে কতদিন চলবে?

প্রিয় ছাত্র-ছাত্রী তোমরা, সুধী অধ্যাপক-অধ্যাপিকামন্ডলী, আপনারা আমাদের কলেজের অবস্থা নিশ্চয়ই দেখছেন।সত্যি কথা বলতে কি,আমরা শিক্ষকেরাই তাই কতক সময় কোনঠাসা হয়ে থাকি।এর কারণ,ওদের এমন একটা পাওয়ার আছে—যা এখানে দেখিয়ে আমাদেরকে শাসন করতে চায়। কিন্তু কলেজ তো জ্ঞান-চর্চার কারখানা।এখানে যদি কারো চোখ রাঙানি আমাদের ছাত্র-ছাত্রী বা আমরা দেখি তবে সেটা মোটেও কাম্য নয়।তবে আমাদের সেগুলো দেখতে হচ্ছে।আপনারা ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে মতামত নিতে পারেন।পাঠদান আমাদের অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু তাদের মনে যে ভয়ের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে সেটা নিয়ে আপনি ভাববেন না—এটা কিন্তু হয় না।আপনি শিক্ষক—তাদেরর মনও আপনার উপাস্য।

যাইহোক,এসবের মূলে যদি আমরা যাই, দেখবো, সেখানে আসলে আমাদের গণতান্ত্রিক চেতনার অভাব আছে।আমাদের ছাত্রছাত্রীরা এই কলেজে তাদের অধিকার নিয়ে সচেতন নয়, তারা কলেজে আসে যায়।আর কেউ কেউ আসে—ক্ষমতার দাপট দেখাতে।যা আমরা সবাই জানি।আমার মনে হয়,আমরা যদি গণতান্ত্রিক হয়ে ওঠি—আমাদের স্টুডেন্টরা আর ভয় পাবে না।বরং মুক্ত পরিবেশে জ্ঞানের চর্চা করতে পারে সেটাই আমাদের কাম্য।

শেষে আমি একটি কথাই বলব,গণতন্ত্র বা রাজনীতি শুধু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয় নয়। আমার মনে হয়,সামাজিক প্রাণী হিসেবে আমরা বর্তমানে সবাই রাজনৈতিকও। আর এটা যদি সঠিক হয়,তবে রাজনীতির চেতনা অবশ্যই কাম্য।যা আমাদেরকে আরো আলো, এই নয়নে ঢালবে।"

অপর্ণা এই বলে শেষ করলো।সাথে সাথে হাত তালি পড়ে গেলো সামনের দিক থেকে।

এক পর্যায়ে মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে শোভন বললেন,"কোনো শিক্ষক বা ছাত্রছাত্রীদের এ ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই জানাবেন।এখন আমাদেরকে শ্রদ্ধেয় প্রিন্সিপাল স্যার কিছু বলবেন।"

—"এখানে যারা উপস্থিত হয়েছে সবাইকে আমার পক্ষ থেকে অনেক শুভেচ্ছা। সবার আগে একটা কথা বলে নিই,

এটাকে আপনারা রাজনীতির দলাদলি দেখবেন না।রাজনীতিতে যে ক্ষত তৈরী হয়েছে তা সারাতে পারে একমাত্র সঠিক শিক্ষা—আর তা হল গণতান্ত্রিক চেতনায় দীপ্ত হওয়া।ছাত্রছাত্রীদের মাঝে তা ছড়িয়ে দেবার দায়িত্ব নেবেন আপনারা।আমার মনে হয়,এটা আমাদের শিক্ষক হিসেবে একটা দায়িত্বও।আমরা যদি আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সঠিক সামাজিক না করে তুলতে পারলাম তাহলে এই বিরাট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কি ব্যর্থ নয়? এই সামাজিকীকরণে গনতন্ত্রের শিক্ষাটা সত্যিই দরকারি।আর সেই দিকে লক্ষ্য আমরা একটা নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করতে যাচ্ছি।

তবে একটা ব্যাপার একটু সবার সামনে পরিষ্কার করার দরকার আছে বলে আমি মনে করি। আমরা বলছি, 'গনতান্ত্রিক চেতনা'—কিন্তু এর মানে কি? এর মানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটা সুন্দর শিক্ষা অর্জন।আর এটার মধ্য দিয়েই আমরা সাম্যতার শিক্ষা পাবো, অন্যের মতামতের, ব্যক্তিস্বাধীনতার মূল্য দিতে শিখবো।আর এটাই তো গণতান্ত্রিক চেতনা,তাই না?

আমাদের কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান ডিপার্টমেন্টের সাথে অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট মিলিত হয়ে একটা উদ্যোগ গ্রহণ করতে চলেছে।উদ্যোগটি এক কথায়

অসাধারণ। তাদের কার্যক্রমের বিস্তারিত লেখা আছে —এই পুস্তিকাতে।কলেজের সর্বোস্তরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই বিশেষ কোর্সটি আমরা শুরু করতে যাচ্ছি।

কিভাবে চলবে কোর্সটি —তা একটু ব্যাখ্যার দরকার আছে?

শোভন আমাকে সেই দায়িত্বটা দিয়েছে।সেই হিসেবে আমি ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সামনে তার নির্যাসটুকু উপস্থাপন করছি।যদিও ইতিমধ্যে ওরা কাজটি অনেক দূর এগিয়েছে।এটা আমাদের কলেজের ইন্টারন্যাল এসেসমেন্টের অন্তর্গত করবার ইচ্ছা আছে।প্রতিটি সাবজেক্টের উপর এই বিশেষ কোর্সটি বিশেষভাবে প্রভাব ফেলবে।আমাদের এই পরীক্ষা-মার্কস সিস্টেম আনার কোনো ভাবনা ছিলো না।কিন্তু এর প্রয়োজনীয়তার নিরিখে আমরা এটি আনলাম।আশা করি,আমাদের অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের কোনো দ্বিমত থাকলে অবশ্যই উক্ত কোর্সটির জন্যে যে শিক্ষকটিম তৈরি করা হয়েছে তাদের সাথে যোগাযোগ করবেন।একটি কথা বলে রাখি,এটা আমাদের কলেজের সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণ বিষয়।তবে ছাত্র-ছাত্রীরা যেন বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে নেয় এবং এ নিয়ে কোনো ভুল বার্তা তাদের মধ্যে যেন না যায়।তারা যেন এটা বুঝতে শেখে, কলেজ লাইফ শেষ হলে অনেক কিছুই হয়তো ভুলে যাবে।কিন্তু এই যে গণতন্ত্রের শিক্ষা, ওদের থেকে যাবে আজীবন।তাছাড়া আমাদের এই বিশেষ কোর্সটি এতটা ইন্টারেস্টিং —ছাত্রছাত্রীরা কিছু দিনের মধ্যেই উপলব্ধি করবে।তারা বুঝতে পারবে,গণতান্ত্রিক চেতনা আসলে একটা ব্যক্তিকে নির্মাণ করতে পারে,সৃষ্টি করতে পারে ব্যাক্তিত্ব।গণতন্ত্রের প্রতিটি স্তম্ভের উপর তাদের ভিতরে তৈরি হবে আস্থা।তারা জেগে উঠতে চাইবে।তারা পাল্টিয়ে দেবে আমাদের কলেজকে।"

এই কথাগুলো বলবার সময় প্রিন্সিপাল স্যারের ভিতরে আলাদা একটা উত্তেজনা সবাই লক্ষ্য করেছে।সাথে সাথে উত্তেজনা পূর্ণ হাততালিতে পুরো কক্ষ ভরে উঠে।স্যারের ব্যক্তব্যের পর, অনেকের মাঝে মনে হল —সমগ্র ব্যাপারটা পরিষ্কার হল।শোভন চাইছে, কিছু প্রশ্নের আহব্বান। সে জানে, অন্যের ভিতরে অনেক প্রশ্ন থাকতে পারে স্যারের বক্তব্যের পর।স্যার সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে মাইক্রোফোন শোভনের হাতে দিয়ে দেয়।

শোভন বলে,"আমরা প্রায় শেষের পথে।আশা করি,স্যার, সমগ্র বিষয়টা পরিষ্কার করেছেন।সকলে বুঝতে পেরেছেন।তবুও অনেক জিজ্ঞাসা থাকতে পারে। কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তবে তা করার অনুরোধ করছি।"

একজন ছাত্র বলল,"স্যার, এই কোর্সটি কি বাধ্যতামূলক? না করলে কি ইন্টারনালে মার্কস কম দেওয়া হবে?"

—"হতে পারে।তবে এটা আমরা নিশ্চিত করে বলছি না।তবে এটা সবাইকে মনে রাখতে হবে কোর্সটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। "

আরো কিছু প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে বিদায় ভাষণ রাখলো অর্পণা।

পরে প্রিন্সিপাল স্যার জানালেন," খুব শিগ্রই নোটিশ দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হবে।আর কখন কোন সেমিস্টারের কাদের ক্লাস হবে তারও জানিয়ে দেওয়া হবে রুটিন করে।"

বেরোবার সময় ওরা কয়েকজন এক সাথে।

"স্যার,আপনার জন্য আমরা এতো সহজে কাজটি করতে পারলাম।" শোভন একটা কৃতজ্ঞতা মাখা মুখ নিয়ে স্যারের দিকে তাকিয়ে বলে।

অপর্ণা,অবনী দা, দেবলীনা দি —সবাই হেটে ডিপার্টমেন্টের দিকে আসতে থাকে।শোভন একবার অপর্ণার দিকে তাকায়,অপর্ণাও দেখে ওকে।অনেক কথা আছে ওদের।অনেক কথা।

১০

প্রিন্সিপাল স্যারের এতো আগ্রহ দেখে অবাক হতে হচ্ছে।যেন তিনিও স্বপ্নের ফেরিওয়ালা। হয়তো এতদিন, এই স্বপ্নই তিনি দেখেছেন।কিছু নতুন কাজে কিছু মানুষের দরকার হয়—যারা নিবেদিত প্রাণ।তাদের পরে ভরসা করা চলে।এখন যেন নতুন দিন দেখবার প্রতীক্ষা তার চোখে মুখে।

তবে শোভনের কাজের চাপ যেন বেড়ে গেলো।পরিকল্পনা আর সেই মাফিক বাস্তবতার জন্ম দেওয়া কখনোই এক ব্যাপার নয়।প্রতিটি বাস্তবতা অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তবেই আসে।বিশেষত পরিকল্পিত কিছুরই।যাইহোক এখন আর পিছু হটবার জায়গা নেই।যদিও একবার মনে একটু সংশয়ী মেঘ জমেছিল,কিন্তু তাকে পাত্তা দেয় নি শোভন।মনে মনে বলে," এগোলে পথ তৈরি হবে।"

আর তাই এগিয়ে যায়।ইতিমধ্যে আগ্রহী শিক্ষকদের নিয়ে একটা টিম গঠিত হয়েছে।যারা সমগ্র কলেজের "গণতান্ত্রিক ক্লাসরুম " পরিচালনা করবে।যথেষ্ট তৎপরতার সাথে।বাংলা ডিপার্টমেন্ট থেকে অপর্ণা ,শোভন আছেন।রাষ্ট্রবিজ্ঞান ডিপার্টমেন্ট থেকে তিনজন আছেন।অর্থনীতির থেকে আছেন নীলরতন দাদা।যিনি প্রথম থেকেই সমানে আগ্রহী।ওনার কথা,"শোভন,স্বপ্ন সবাই দেখতে পারে না।বাস্তবায়ন তো দূরের কথা।আমাদের এই কাজে অনেকে বিরোধিতা করবে কিন্তু তাই বলে বসে আমরা থাকবো না।"

এমন অনেক সাহসের বার্তা কতজনের কাছ থেকেই পেয়েছে শোভন।তবে বিরোধিতাও এসেছে।

একজন অধ্যাপক সেদিন প্রশ্ন তুললেন," একে তো কতগুলো ক্লাস থাকে প্রতিদিন। তার উপরে বাড়তি চাপ।কিভাবে সামলাবে?"

রেগে যায় না শোভন।ধীরে ধীরে তাকে বুঝিয়ে দেয়—এ কার্য করতে একটু স্বপ্নের দরকার হয়।একটু গন্ডি পেরোবার সাহস থাকার প্রয়োজন পড়ে।

কিছুটা ভয় যে নেই, তাও নয়।তবে সে সব ভয় তোয়াক্কা করলে,এই পথে এগোনোই যাবে না তা সে জানে।কিছুটা বাধা যদিই না থাকল তবে এগোবার আনন্দ কোথায়?

একদিন মিটিং হল।শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে।একটা বিষয় খুব জোরালো হয়ে দেখা দিল সবার কাছে।ক্লাসে কি পড়ানো হবে?কিভাবেই বা পড়ানো হবে?

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অসীম দাদা ছিলেন, নবনীতা দিদি ছিলেন।ওনাদের সাথে সেই প্রথম থেকেই যোগাযোগ রাখা হয়েছে।শোভন বাংলা নিয়ে পড়লেও, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বই-পত্তর পড়া আছে ওর।জানা আছে,অ আ ক খ।

শোভন বলে," আমার মনে হয়, যেহেতু আমাদের এই কার্যক্রম সম্পূর্ণ নতুন সেহেতু আমাদের এতে একটু নতুনত্ব রাখলে ভালো হবে।প্রথমত, ছাত্রছাত্রীদেরকে মোটিভেট করতে হবে।এটাকে যেনো তারা পরীক্ষা পাশের কিছু না ভাবে।বরং জীবন গঠনের, নিজেদেরকে সুনাগরিক করবার একটা প্রত্যয় নিজের মধ্যে তাদের গঠিত হয়।"

সবাই শুনল শোভনের কথা।সমর্থনও করল।

অপর্ণা এবার কিছু বলল," ব্যাপারটাকে একটু অন্যভাবে দেখা যেতে পারে। শোভনের কথার পরে মাথায় এলো হঠাৎ।দেখুন, আমাদের ছেলেমেয়েরা এখন স্কুল-কলেজে অনেক কিছু শিখলেও, তারা জীবনকে কিভাবে এগিয়ে নিতে হয়,সে শিক্ষা পাচ্ছে না।আমার মনে হয়,এটাকে আমাদের একটা সুযোগ হিসেবে নেওয়া উচিত। তাদের জীবন-পাঠ আমরা শেখাবো।সুনাগরিক হওয়া তো তাতেই থাকবে।আর এটা করতে পারলে, আমাদের কার্যক্রম আরো দ্রুত অগ্রসর হবে —এটা আমার মনে হচ্ছে।"

শুরুটা একটু কষ্টের হবে শিক্ষক-টিমের জন্যে।স্থির হয়েছে,প্রথমত, ফার্স্ট-সেকেন্ড-থার্ড ইয়ারের বর্তমান স্টুডেন্টদেরকে ক্লাস নেওয়া হবে।তারপরে, প্রতি বছরের ফার্স্ট ইয়ারের জন্যে এক বছরের কোর্স চালু থাকবে।তাছাড়া,প্রজেক্টরের মাধ্যমে ক্লাস নেওয়ার এবং ইউটিউবে একটা ক্লাসরুম করার পরিকল্পনাও আছে।প্রতি দিনকার ক্লাস ওখানে আপলোড

করা হবে।যাতে অনুপস্থিত স্টুডেন্টরা ওখান থেকে দেখে নিতে পারে।আর অন্যরাও যাতে দেখতে পায়।

ওদের এই অভিযান তো –নির্দিষ্ট কারো জন্যে নয়।এক হিসেবে, সমাজের সর্বোস্তরের মানুষের মধ্যে চেতনা ছড়িয়ে দেবার লক্ষ্যে এই পথচলা।যেভাবে পারা যায়,যতটা মানুষের কাছে পৌছানো যায় ততোই ভালো হবে।

শেষমেশ শিক্ষকেরা মিলিত হয়ে একটা পাঠক্রম দাড় করাবার প্রস্তাব দেয়।

" ডেল কার্ণেগী বা অন্যান্য লেখকদের কিছু বইকেও পাঠ্য সূচির আয়তায় আনা হোক।"বলে প্রস্তাব জানায় একজন অধ্যাপক।

নিঃসন্দেহে উত্তম প্রস্তাব।ডেল কার্ণেগী সেই স্কুলে থাকতে কত পড়েছে।জীবনের অনেক চড়াৎ-উৎরাই পেরিয়েই যে সাফল্য ধরা দেয়–তারযেন অনেকটা ডেল কার্ণেগীর কাছ থেকে শেখা।

এক সময় প্রচন্ড দুঃচিন্তায় ভেঙ্গে পড়া শোভন, জেগে উঠতে পেরেছিল, তাঁর "দুঃচিন্তা মুক্ত নতুন জীবন " বইয়ের ডা অসলারের গল্প থেকে।শিখেছিল, সবচেয়ে খারাপকে মেনে নিয়ে একটু একটু করে দাড়াবার স্বপ্ন দেখতে।সেও ভেবেছে,এই সব বই আমাদের প্রজন্মকে পড়ানো উচিত। শুধু ডেল কার্ণেগী নয়, এই সারির আরো অনেক লেখকের সাথে শোভনের পরিচয় যেন খুব ঘনিষ্ট।নেপোলিয়ান হিলের "থিংক এন্ড গ্রো রিচ" কিংবা ডেভিড শ্বার্টজের " দ্যা ম্যাজিক অব বিগ থিংকিং" ওকে উদ্দীপিত করেছে।ভেঙ্গে পড়া শোভন উঠে বসেছে।উদ্যমী হয়ে আবার শুরু করেছে।তাই ওনার প্রস্তাবকে শোভন সম্পূর্ণ সমর্থন জানায়।

তারপর গণতান্ত্রিক শিক্ষার উপর কিছু বই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষকদের সহায়তা সিলেক্ট হয়।তাছাড়া,শোভনও ওর জানা কয়েকটি বই প্রস্তাব করে।

সবশেষে একটা রুটিন তৈরি হয়। এবং প্রিন্সিপালের সাথে সেদিনই কথা হয় শোভনের।তবে তিনি খুব ব্যস্ত থাকায় ঠিকভাবে, কথা বলতে পারলেন না।বললেন,"রাতের দিকে একবার ফোন করো শোভন।"

১১

তিন বছর পরের একদিন।

শোভন এখন বাকুড়ায় আছে।ওখানেই থাকে।আদিবাসী ছেলে-মেয়েদের পড়ালেখা শেখায়।শেখানোটা যে ওর রক্তে।আর ওটা ছাড়া আর কীই বা পারে সে।

অপর্ণা বারবার ফোন করে বলে,"শোভন,তোমার চাকরী নেই, তাতে কি হয়েছে—এসো আমরা বিয়ে করি।তুমি এতো ভেঙ্গে পড়ছো কেন?"

কিছুদিন আগেও সে বুঝতে পারে নি,চোখের সামনে সবকিছু এভাবে পাল্টে যাবে।এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হবার কথা মাথাতে যে ছিল না তা নয়।তবে সম্পূর্ণ মিথ্যের পরে তার এ নির্বাসন। মাঝে মাঝে চিৎকার করে, সবাইকে সত্যটা জানাতে চায়।কিন্তু সেই সত্য, জানে সবাই।মুখে ফুটে বেরোতে চায় না।তবে অপেক্ষা করে শোভন।ঠিক একদিন সে ফিরে পাবে তার সেই কলেজ,সেই ক্লাসরুম। যে ক্লাসরুম তাকে টেনেছে।যে ক্লাসরূমে প্রতিনিয়ত শোভন স্বপ্নের বীজ রোপণ করতে চেয়েছে পরম সোহাগ ভরে।

শোভন অপর্ণার কাছ থেকেও দূরে থাকতে চেয়েছে।কিন্তু একমাত্র অপর্ণাই যেন এখনো ওকে আকঁড়ে ধরে আছে।এত ঝড় গেলো, হাত ছাড়ে নি সে।বরং কত তীব্র বাতাসের সম্মুখে নিজেকে আগলে দিয়ে চেষ্টা করেছিল,শোভনের চাকরীটা বাঁচাবার।আইনের মার প্যাচে তা আর হল না।অপর্ণাকেও হুশিয়ারি দেওয়া হয়েছিল।

অপর্ণা এভাবে বিয়ের কথা আগে বলতো না।এখন কেমন যেন —শোভনকে ছাড়া ওর ভালো লাগে না।আর সহযোদ্ধা হিসেবে অপর্ণা সে দায় খানিকটা নিজের কাধেও নিতে চায়।তবে এই বিয়ের সিদ্ধান্তটা হঠাৎ অপর্ণা নেয় নি।

মাঝের এই সময়টাতে দুজনে আরো ঘনিষ্ঠ হয়েছে।কত ছোটখাট ব্যাথাতে নিজেদের মধ্যে নিজেরা হারিয়ে গেছে ওরা।কত রাত্রি কেটে গেছে নির্ঘুম।শোভন কিছুতেই ভুলতে পারছিল না, সেই দুঃসময়ের কথা।যখন

খানিকটা পালিয়েই সে আশ্রয় নিয়েছিল অপর্ণার ফ্লাটে।

সেদিন কলেজে ছাত্র-সংসদের নির্বাচন ছিল।অন্যদিনের মতোই শোভন কলেজে যায়।নির্বাচন পরিচালনের দায়িত্বে অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সেও একজন।শোভন,খানিকটা আন্দাজ করতে পেরেছিল,এবারের নির্বাচনটি কেমন হবে।ইতিমধ্যে ওদের গণতান্ত্রিক ক্লাসরুম তার পরিধি বাড়িয়েছে।অনার্সের স্টুডেন্টরা, পাশের স্টুডেন্টরা সমানে যোগ দিয়েছে।জীবনের পাঠ শিখেছে। সেই সব দিনের ডায়েরী শোভন লিখেছে। ডায়েরীটার নাম দিয়েছে "গনতান্ত্রিক ক্লাসরুম"—

"ব্যাপারটা খানিকটা দিয়াশলাই বাক্সে আগুন দেবার মতো।একটা কাঠিতে আগুন দিতে পারলে,মূহুর্তেই তা ছড়িয়ে পড়বে সমগ্র বাক্সে।আমি চোখের সামনে দেখছি আমার স্বপ্নের বেড়ে ওঠা।হেসে খেলে এগিয়ে চলা।কীভাবে যেন প্রজ্জ্বলিত আলোকের উপর পতঙ্গের অবগাহন,নৃত্যের ছন্দে তারা তাদের আনন্দে সঞ্চারিত করতে চাইছে দিকে দিকে।

শুরুর দিনের ঘটনা বলি।

প্রিন্সিপাল স্যারের সাথে কথা বলে, অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের সাথে সামঞ্জস্য রেখে রুটিন তৈরি হল।রুটিন মতো ক্লাস।সেদিন থার্ড ইয়ারের সায়েন্স অনার্সদের ক্লাস ছিল। আমার ক্লাস ছিল।ক্লাসে আমার অভ্যস্ততা ছিল।তবুও যেহেতু সম্পূর্ণ নতুন একটা পথচলা সে কথা ভেবে একটু ভয়ে ছিলাম।

সায়েন্স বিল্ডিং একটা বড় রুম।তবে আজকে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি শুরু করার মতো।সবাই আমার চোখে নতুন।কারো সাথে কোনো পরিচয় নেই।একটা উত্তেজনা কাজ করছে ভিতরে ভিতরে।কিভাবে শুরু করবো — অবশ্য আজকে প্রস্তুতি নিয়ে আসছি।ইচ্ছে ছিল,সমগ্র বিষয়টার একটা রূপরেখা তাদের সামনে দাড় করাবার।যেন তারা বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারে।

প্রথমে আমি অঙ্ক ডিপার্টমেন্টের স্টাফ রুমে ছিলাম।একটু পরে ঠিক ১১ঃ৩০ নাগাদ ক্লাসে ঢুকলাম।ছাত্র-ছাত্রীরা উঠে দাড়াল।সবাইকে বসতে বললাম।এখানে, অঙ্ক, পদার্থবিজ্ঞান,রসায়ন, বায়োলজি আর কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্টরা আছে।

নিশ্চুপ ক্লাস।পিনপতন নীরাবতা যাকে বলে।আমি বললাম,একটু হাসতে হাসতেই, "তোমাদের সবার সাথে পরিচিত হতে ইচ্ছে করে।কিন্তু এই যে দেখছো ঘড়ি,এর কাটা ঘুরতে ঘুরতে শেষ হয়ে যাবে।তবে তোমাদের দেখে আমি সত্যিই আপ্লুত।যে তোমাদের নতুনত্বে আগ্রহ আছে।তোমরা নতুন কিছু এখনো খোজো।

" স্যার, আপনার নাম কি?" সামনের বেঞ্চ থেকে একটা মেয়ে জানতে চাইল।আসলে আগেই বলা উচিত ছিল।বললাম," শোভন দাস"।

ক্লাসটির কথা লিখতে গিয়ে এই এখন তাই আমার ভিতরে শিহরণ জাগছে।মনে হচ্ছে,কত সুন্দর ভাবে আজকে শুরু হল দিনটি।

যাইহোক, আগে সিলেবাস বা পাঠ্যক্রমের কোনো ভয়াবহতা এদের সামনে তুলে ধরে সময় পন্ড করবার কোনো মানেই খুজে পেলাম না।

তাই শুরু করলাম,আমাদের এই রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে সঠিকভাবে চেনানো।মূল উদ্দেশ্য ছিল,এর ইতিহাসের দিকে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া।

এক পর্যায়ে এক ছাত্র জিজ্ঞাসা করেই ফেলল," স্যার, আমরা যে এখন এই সরকার সরকার করি?অনেক আগে, সেই মধ্যযুগ বা তারও আগে কেমন ছিলো?মানে স্যার আমি জানতে চাইছি, সে সব সময় একটা দেশ বা রাজ্য কিভাবে পরিচালিত হতো আর এখন এই পর্যায়ে এলো বা কী করে?"

প্রশ্নটি শুনে মন ভরে উঠল।

সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললাম,শোনো তোমাদের মতো আমিও রাষ্ট্রবিজ্ঞান কখনো সাবজেক্ট হিসেবে পড়ি নি।কিন্তু কোন সাহসে বলতে পারো তোমাদের

পড়াতে এলাম।আমার মাথাও এই রাষ্ট্রব্যবস্থা নিয়ে অনেক প্রশ্ন কিলবিল করতো।সেই সব প্রশ্নের উত্তর খুজতে খুজতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান জেনেছি।ওর প্রশ্নের উত্তরটিও আমি দিতে চেষ্টা করলাম।আমার ইচ্ছে ছিল,ওদের ভিতরে আগ্রহ জমাবার। বা ওরা যেন প্রত্যেকেই একটা ধারনা অন্তত শিখে নেয়।জীবনের পাঠ হিসেবে।

ক্লাস শেষের দিকে বুঝতে পারলাম –ক্লাসটি কিন্তু অনেকটাই সফল।কেননা,অনেকের মধ্য থেকে পরবর্তী ক্লাস কবে হবে,তা নিয়ে একটা গুঞ্জন শুনলাম।

ক্লাস শেষ হবার পরে, একজন ছাত্রী বলল," স্যার,এটা কি এক বছরের জন্যে?"

"হ্যাঁ , এটা এক বছরের কোর্স।সত্যি বলতে কী আমাদের ইচ্ছে,তোমরা দেশের সুনাগরিক হবার পাশাপাশি, একজন ভালো মানুষ হয়ে ওঠো।"

তখন ক্লাসভর্তি হট্টোগোল।আমি বেরিয়ে আসি।একটা আলাদা উন্মাদনায় বুক ভরে যায়।নিঃশ্বাসে মিশে যায়, একটা ছোট্ট সফলতার গল্প।প্রথম দিনের এই সুন্দর অনুভূতি গুলো।

এই সময় অপর্ণাকে যেন বেশি করে মনে পড়ল ।এই অনুভূতির কথা সংগোপনে ওকে জানাতে চাই যে।

বিজ্ঞান ডিপার্টমেন্টের ব্যাপারে একটা অন্যরকম ভাবনা ছিল আমার। কিন্তু এই সব ছেলেমেয়েদের একাগ্রতা আমার সে ধারনা উড়িয়ে দিয়ে তাদের প্রতি একটা ভালোবাসা সৃষ্টি করেছে।আমিও মুখিয়ে রইলাম পরবর্তী ক্লাসে তাদের সাথে দেখা হবার আশায়।"

এইভাবে "গণতান্ত্রিক ক্লাসরুম" ডায়েরীখানি ভরে উঠেছে।হাসি আনন্দ, হালকা তত্ত্বের ভিড়ে শোভন মিশে গেছে।বারবার সেটা পড়ে শোভন।ওর ওই সময়টা শিক্ষক জীবনের জীবন্ত দলিল যে!

১২

শোভনের ডায়েরী পড়েই জানা যায় ছাত্রসংসদ নির্বাচনের দিনে কি হয়েছিল।ডায়েরিটা কল্যাণীতে অপর্নার ফ্ল্যাটে বসে লেখা।

সেদিন অপর্ণাও কলেজে ছিল।কিছুটা সেও আন্দাজ করতে পেরেছিল, কোন দিকে যাচ্ছে পরিস্থিতি।তবে ব্যস্ততার দরুন একটুও আলাপ হয়ে ওঠে নি।

অপর্ণা ফোনে বলে,"শোভন, মনে হচ্ছে কিছু একটা ঘটবে।তোমার উপরে চাপ আসতে পারে।তুমি এক কাজ করবে?কল্যাণীতে চলে যেতে পারো? আমি নয় পরের ট্রেনে আসবো?আমার ওখানে থাকবে।"

শোভনও যে বিষয়টা বুঝতে পারে নি তা নয়।ধীরে ধীরে গণতান্ত্রিক ক্লাসরুম যতোই জনপ্রিয়তা পেয়েছে ততোই শোভনের উপর কিছু কিছু চোখের দৃষ্টি অন্য রকম হয়ে এসেছে।তবে গণতন্ত্রের ক্লাসরুমের বিশাল ছাত-ছাত্রীরা বারবার শোভনকে আগলে রেখেছে।বারবার ওর পাশে থেকেছে।এদিনও সেই সব ছাত্র-ছাত্রীদের নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে অংশ গ্রহণ ছিলো চোখে পড়ার মতো।ওদের নিয়ে শোভনের একটা ভয়ও ছিলো।যারা জেগে উঠেছে আপন অধিকারে, তাদেরকে রুখবার মতো সাহস তার নেই।কেননা,এরা যে তারই মানস পুত্র-কণ্যা।এতোদিন ধরে সে তো এদেরকেই চাইছিল।যারা জেগে উঠবে।আধিপত্য যারা মেনে নেবে না।

তবে সরাসরি শোভন কোনো পক্ষপাতিত্ব করে নি কখনো।এখন শিক্ষক হিসেবে শিখিয়ে যেতে চেয়েছে।অন্যান্য শিক্ষকেরাও এই যুদ্ধের এক-একজন সৈনিক হিসেবে কাজ করেছে।তারা প্রত্যেকেই, চেয়েছে "গণতান্ত্রিক ক্লাসরুম"এ নিজেদেরকে উজাড় করে দিতে।হয়তো তারই ফলশ্রুতি এটাই।

বুঝতে পারছিল,আজকের নির্বাচনে গণতান্ত্রিক ক্লাসরুমের প্রার্থীদের জয়ী হবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

এরা কোনো দলের হয়ে লড়ায়ে নামে নি।

একটা স্লোগান দিয়েছে "কলেজ আমাদের,আমরা কলেজের" বা " কলেজের ভালো-মন্দ, আমরা বুঝবো আমরা বুঝবো। "

ভোট ব্যাপারটাই একটা উত্তেজনার।গন্ডোগোলের আচ পাওয়া যাচ্ছে।ভোট যদিও শেষ হয় নি।তবে পুলিশের উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

অপর্ণার বলা শেষ হলে শোভন বলে, " কিন্তু—"।

"কোনো কিন্তু নয় শোভন,ওরা সবাই এখন হিংস্র হয়ে যাবে।জীবনে বেঁচে থাকলে অনেক কিছু করতে পারবে।"

"না,......... এখনোতো আমি ডিউটিতে আছি।" শোভন বলে।

"অন্যরা নেই?আর ভোটতো প্রায় শেষের পথে।তুমি একটু তাড়াতাড়ি করো।" অপর্ণার কথায় গভীর উত্তেজনার ছাপ দেখা দেয়।

শোভন বুঝতে পারে না কি করবে?এতোদিন ধরে তেমন কোনো ভয়ই ওর ছিলো না।কিন্তু এখন কেমন যেন ভয় পাচ্ছে।স্নায়ু অবশ হয়ে আসছে।জীবনে কখনো এমন পরিস্থিতে সে পড়ে নি।

আবার অপর্ণার ফোন এলো।

"শোভন আমি নিলয় -পার্থদের পাঠাচ্ছি তোমার রুমের সামনে। তুমি বেরিয়ে আসার চেষ্টা করো।"

শোভন বেরিয়ে আসার কথাই ভাবে।এখন আর মনে কোনো সংশয় রাখতে চায় না।যে করেই হোক বেরোতেই হবে, কিন্তু নিলয়কে দেখতে পেয়ে খানিকটা স্বস্তি পায়।

তবে ব্যাগ ডিপার্টমেন্টেই রয়ে গেছে।অপর্ণা আছে ওখানে।

অপর্ণাকে ফোনে বলে,"ওরা এসছে।আমি ওদের সঙ্গে স্টেশনে যাচ্ছি।চারটের ট্রেন মনে হয় পেয়ে যাবো।আমার ব্যাগটা থাকল।যদি ওটা না আনতে পারো।ওর ভিতরে একটা ডায়েরি আর একটা বই আছে।ওই দুটো নিয়ে এসো।পরে কথা বলছি।"

"ঠিক আছে।তুমি যাও।" বলে রেখে দেয় ফোন।

অপর্ণা ডিপার্টমেন্টেই আছে।সারাক্ষণ শোভনকে নিয়ে ভাবছে।তখন কারা যেন এসে বলে গেল,"ম্যাডাম,আজকে গন্ডগোল হতে পারে—"

তারপর থেকে যেন কেমন একটা ভয়ে ভয়ে আছে।

তবে বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীদের কাছে শোভন এখন পরিচিত মুখ।সমস্যা হল,বহিরাগতদের নিয়ে।তারা যদি অস্ত্র-সস্ত্র নিয়ে কলেজে ঢুকে পড়ে।একবার পিছন জানালা দিয়ে অপর্ণা তাকিয়ে দেখেছে,সবাই কেমন যেন মুখিয়ে আছে।পুলিশি পাহারায়,ভিতরে ডুকতে পারছে না।

এভাবে পালিয়ে যেতে শোভনের বিবেকে বাধে।কিন্তু এটাকে ও এখন পালানো হিসেবে দেখছে না।দেখছে, কৌশল হিসেবে । তাছাড়া, এটা ঠিক যে, যদি গণতান্ত্রিক ক্লাসরুম জিতেও যায় —তবুও রিস্ক থেকে যাবে।কেননা,বিরোধীরা তো অস্ত্রধারী।কিন্তু গণতন্ত্রের ক্লাসরুম তো অস্ত্রের ক্ষমতায় বিশ্বাসী না।সেই জন্যে, অন্তত এখন নিজেকে বাঁচাবার জন্যে এটা করতে হবে তাকে।

ওরা শোভনকে নিয়ে ট্রেন না আসা পর্যন্ত স্টেশনেই থাকে।

অপর্ণার কল,"শোভন ট্রেনে উঠেছো?ট্রেন এসছে?"

"না,সিগন্যাল হয়ে গেছে।এখনই ঢুকবে।"

—"তাড়াতাড়ি উঠে যাও।বাইরে একটা গুলির শব্দ হল।বুঝতে পারছি না—কি

হল?উঠে একটু জানিও। আর আমি পরের ট্রেনে আসছি।তুমি কল্যাণীতি গিয়ে কিছু খেয়ে নিও।টাকা আছে?"

—"হ্যাঁ, আছে।সমস্যা নেই।"

নিলয় বলে,"স্যার, ওরা অস্ত্র নিয়ে ঘুরছে।"

—"হুম,অপর্ণা বলল , গুলিও হয়েছে বলে।"

ওরা একটু থমকে যায়।ফোন করে কোনো বন্ধুর কাছে," বলে —গুলি হয়েছে?"

—"হ্যাঁ, শব্দ শুনলাম। তবে ফাঁকা গুলি।"

"তোমরা সাবধানে থেকো।কি করবো?এভাবে তোমাদের ফেলে রেখে—"শোভনের কথা শেষ না হতেই পার্থ বলে," স্যার,আপনার উপর ওদের রাগ।আগে আপনাকে নিরাপদে থাকতে হবে।আমরা সাবধানে থাকবো।"

তার পর যাবতীয় কিছু শোভন জানতে পারে অপর্ণা ফিরে এলে।আসতে আসতে রাত নয়টা বেজে যায়।কত উত্তেজনা নিয়ে শোভন অপেক্ষা করে।এর আগে শোভন একবার অপর্ণার ফ্ল্যাটে গিয়েছিল।মাসিও চিনতো।স্নেহাও ওকে চেনে।তাছাড়া,মাঝে মাঝে স্নেহার সাথে গল্প করে।মাসিকে মনে হয় আগের থেকে অপর্ণা ফোন করে রেখেছিল।শোভন যেতেই বলে, "বাবা, খেয়ে নাও।আমি রান্না করে রেখেছি। "

"মাসি,অপর্ণা আপনাকে ফোন করেছিল?" শোভন জানতে চেয়ে মাসির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে।ঠিক যেন শোভনের মায়ের বয়সী।কেন জানি না—শোভনের হঠাৎ মায়ের কথা মনে পড়ে।মা যে ওকে নিয়ে চিন্তায় থাকে সে যেন আরো একটু গভীরভাবে উপলব্ধি করছে এখন।এখন মনে হচ্ছে,মায়ের কাছই ওর জন্য কত নিরাপদ। যেমন পাখির ছানারা মায়ের বুকে কালবৈশাখীর তীব্র হাওয়াতেও নিরাপদ বোধ করে।

আর অপর্ণাকে কিছু বলার নেই।ওর জন্য মনের মধ্যে একটা আলাদা জায়গা রেখে সেই নয়টা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল।স্নেহাকে কিছুটা পড়াতে চেষ্টা করল।সেও কেমন যেন মায়ের জন্য উতলা হয়ে উঠেছে।কতক্ষণ দেখে না।বারবার মাসিকে বলছে,"দিদা,মা কখন আসবে?"

একটু বাদেই বাইরে থেকে অপর্ণার কন্ঠস্বর শোনা যায়।স্নেহা দৌড়ে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে,"এতক্ষণ কোথায় ছিলে মা?বলো কোথায় ছিলে?"

বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে।ওর ছাতা থাকা সত্ত্বেও দু'একফোটা লেগেছে।বলে,"ছাড় মা, আমার গা ভেজা।ঠান্ডা লাগবে।কলেজে আজ অনেক কাজ ছিল।"

"মা, শোভন আঙ্কেল এসছে।আমার ঘরে।আমাকে পড়িয়েছে।"বলে হেসে দেয় ও।

" মাসি,ও খেয়েছে?"মাসি অদূরের দাড়িয়ে ছিল।

"হ্যাঁ, খেয়েছে।দেখে বেশ মনে হচ্ছে টেনশনে আছে।" মাসি একটু ধীরে ধীরে বলে অপর্ণাকে।

"হ্যাঁ, কলেজে ঝামেলা চলছে তো—"

অপর্ণা ওর ঘরে যায়।ব্যাগ থেকে, ডায়েরী আর বইটা বের করে আগে।বইদুটো নিয়ে স্নেহার পড়ার ঘরে যায়।ছোট্ট একটি চৌকি পাতা আছে।পাশে স্নেহার রং পেন্সিল ছড়ানো।দেখে,শোভন ছবি আকছে।অপর্ণা বুঝতে পারে, অবিকল তার মুখ।আর স্নেহা ওকে জড়িয়ে ধরছে।

ছবিটা দেখেও ছবি সম্পর্কে কিছু বলে না অপর্ণা।বলে,"সেই সময়, তুমি না বেরিয়ে এলে যে কি বিপদ ঘটতো?শেষে ওরা তোমার নামে স্লোগান দিচ্ছে-

‘শোভন কোথায় শোভন কোথায়

ধরে আনো ধরে আনো।'

কি হতো তুমি বুঝতে পারছো?"

শোভন বলে," অবণি দা ফোন করেছিল, বলল,গণতান্ত্রিক ক্লাসরুম জয়ী হয়েছে।"শোভনের সেই স্বপ্ন যেন পূর্ণ হয়েছে।বারবার একটা টেনশন ছিল—ওরা ঠিকভাবে ভোট দিতে দেবে তো?

"তবে শোভন,পুলিশের উপস্থিতি যথেষ্ট কাজ দিয়েছে।অন্তত ভোট চলাকালীন কেউ এসে কিছু করতে পারে নি।"

সেটা শোভনও লক্ষ্য করেছে।

"অপর্ণা, বুঝলে—গণতান্ত্রিক চেতনা আমাদের কিভাবে জাগাতে পারে? আমরা কিন্তু কখনোই ওদেরকে প্রভাবিত করতে চাইনি।শুধু শিখিয়েছি—।"

অপর্ণা এখনো শাড়ী চেঞ্জ করে নি।

"তুমি ভিজে আছো তো?যাও ফ্রেশ হও একটু?খুব রোগা হয়ে গেছো আজ?"

—"হুম যাচ্ছি।"

বাইরে এখনো বৃষ্টি হচ্ছে।অনেক রাত হয়ে গেছে।স্নেহাটা একটু আগে ঘুমিয়ে গেলো।বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে বেলকনিতে এসে দাঁড়ায় অপর্ণা।

"শোভন,দেখো কেমন বৃষ্টি!"

শোভন দেখতে চায় বৃষ্টিকে।কিন্তু বেশিক্ষণ দেখা হয় না তার।অপর্ণার চুলের একটা ঘ্রাণ এসে নাকে লাগছে ওর।ভেজা ভেজা চুল।পাশাপাশি দাড়িয়ে দু'জন।

ক্লান্তিতে ভরে ওঠা অপর্ণার চোখে তাকায় সে।

মনে হচ্ছে,একবার অপর্ণাকে বুকে টেনে নিয়ে বলে,"তুমি আমাকে কেন এতো ভালোবাসো?"

লেখক পরিচিতিঃ এখনো পরিচয় দেবার মতো কিছু হয় নি।এটিই লেখকের প্রথম বই।

সমাপ্ত